বিশেষ সংখ্যা

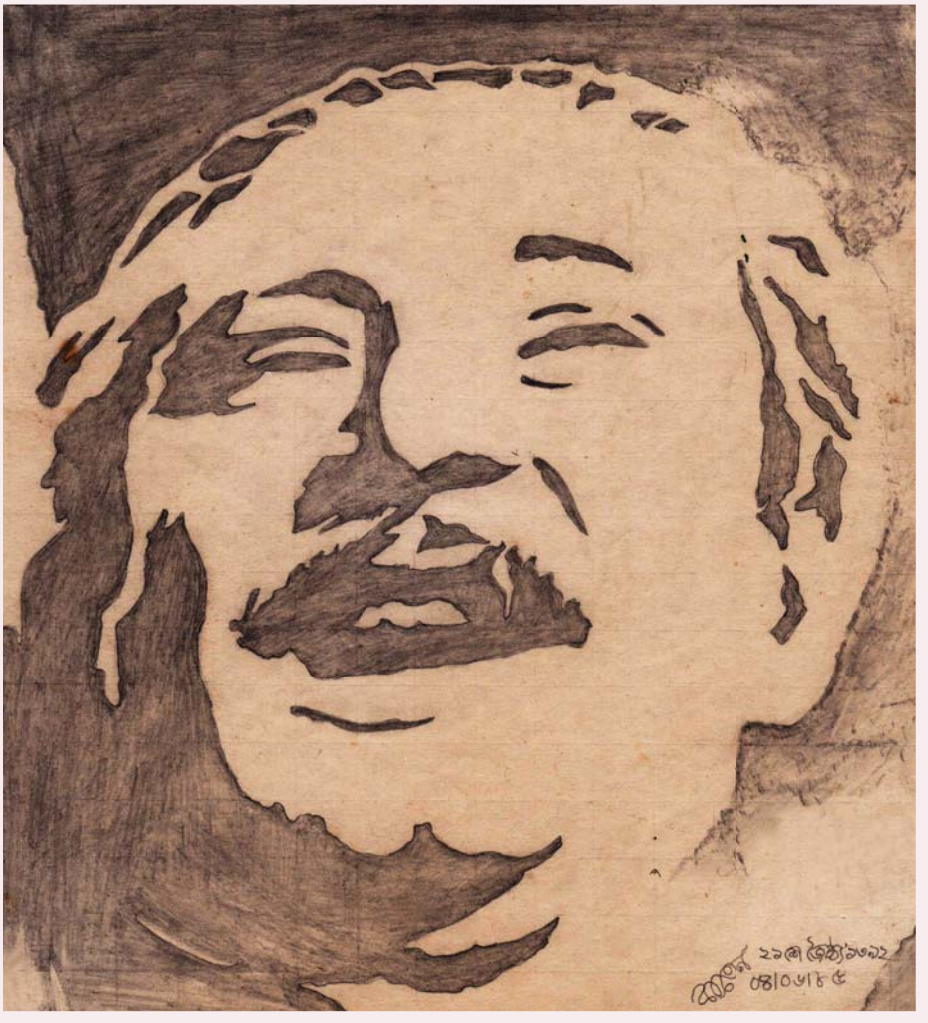

আগস্ট ২০১৯ ❑ শ্রাবণ - ভাদ্র ১৪২৬

নবারুণ

সচিত্র কিশোর মাসিক পত্রিকা

১৫ই আগস্ট

শিশু-কিশোররা যা জানতে চায়

আয়ান হক ভূঁঞা, নার্সারি শ্রেণি, স্টার হাতেখড়ি ইন্টারন্যাশনাল স্কুল

রাইসা হোসাইন অর্না, দশম শ্রেণি, পোস্ট অফিস হাই স্কুল, ঢাকা

সম্পাদকীয়

শৈশব থেকেই ছিলেন প্রতিবাদী। এ দেশের মানুষকে প্রতিবাদী হতে শিখিয়েছিলেন। ১৯৭১ সালে স্বাধীনতার ঘোষণা দিলেন। পাকিস্তানের কারাগারে বন্দি করে রাখা হলো তাঁকে। পাকিস্তানিরা ভেবেছিল, তিনি সামনে না থাকলে মুক্তিকামী বিচ্ছুরা দমে যাবে। না, তিনি নেই এটা কেউ ভাবেননি। তাঁকে সামনে রেখেই মুক্তিযুদ্ধ চলেছিল। লাখো মানুষ জীবন দিয়েছিলেন। বাংলাদেশকে স্বাধীন করেছিলেন।

স্বাধীন দেশে তিনি ফিরে এসেছিলেন। দেশ গড়ছিলেন। ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগস্ট চরম আঘাত হেনেছিল শত্রুরা। ভেবেছে, তাঁকে হত্যা করলে, তিনি না থাকলে বাংলাদেশ এগিয়ে যেতে পারবে না। বহু বছর তাঁকে মুছে ফেলার, তাঁর নাম যেন কেউ না বলে, সেই ঘৃণ্য চেষ্টা করে গেছে এরা। পারেনি। এতকাল পরেও তিনি নেই, কে বলে এ কথা? তিনি আছেন। খুব ভালোভাবেই আছেন।

আগস্ট শোকের মাস। আগস্ট শোককে শক্তিতে পরিণত করার মাস। জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের শক্তি ছিল এ দেশের মানুষ। আর এ দেশের মানুষের শক্তি হচ্ছেন তিনি। সেই শক্তিতে তাঁর সুযোগ্য সন্তান বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশটাকে গড়ছেন। দেশের মানুষ এই কাজে হাত মিলিয়েছে। আর তাই, তিনি আছেন, তিনি থাকবেন।

বন্ধুরা, আগামীর বাংলাদেশ তোমাদের। তাঁর সাথে স্বপ্ন দেখতে, স্বপ্নকে বাস্তবায়ন করতে প্রস্তুত হও তুমিও। তোমার মাঝেই তিনি ফিরছেন, টের পাচ্ছ তো?

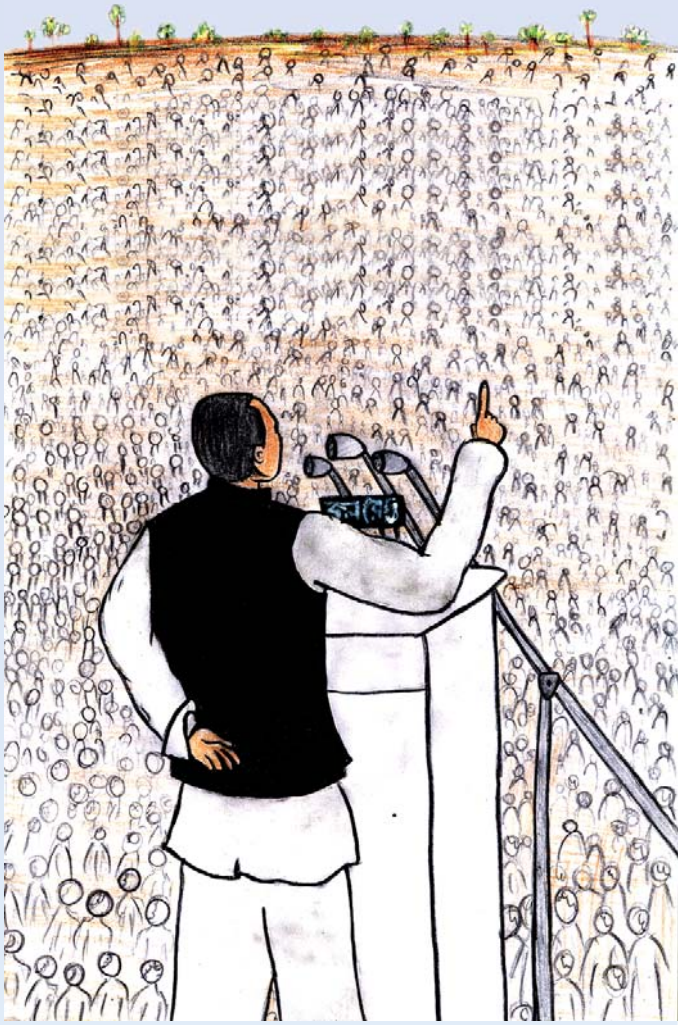

বিন্তি প্রতিকা, অষ্টম শ্রেণি, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

প্রধান সম্পাদক: মোহাম্মদ ইসতাক হোসেন **সিনিয়র সম্পাদক:** মো. জাহিদুল ইসলাম **সম্পাদক:** নাসরীন জাহান লিপি
সহ-সম্পাদক: শাহানা আফরোজ, মো. জামাল উদ্দিন, তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা
সম্পাদকীয় সহযোগী: মেজবাউল হক, সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি
সহযোগী শিল্পনির্দেশক: সুবর্ণা শীল **অলংকরণ:** নাহ্‌রীন সুলতানা

যোগাযোগ : সম্পাদনা শাখা, চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৩১১৮৫, **E-mail :** editornobarun@dfp.gov.bd, **ওয়েবসাইট:** www.dfp.gov.bd

বিক্রয় ও বিতরণ: সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বিতরণ), চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর, ১১২, সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০
ফোন : ৯৩৫৭৪৯০, **মূল্য:** ২০.০০ টাকা। **মুদ্রণ :** মিতু প্রিন্টিং প্রেস অ্যান্ড প্যাকেজিং, ১০/১ নয়াপল্টন, ঢাকা-১০০০

সূচি

নিবন্ধ

০৫ ১৫ই আগস্ট: শিশু-কিশোররা যা জানতে চায়
মিনার মনসুর

১৮ বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব: দৃষ্টিসীমায় সেরা মানুষ
সিরু বাঙালি

২৫ ছাত্র মুজিবের মহত্ত্ব ও নেতৃত্ব/ অনুপম হায়াৎ

২৭ শিশুদের মাঝে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গবন্ধুর শিশুস্নেহ
আখতারুল ইসলাম

২৯ বঙ্গবন্ধুর ঈদ কেমন ছিল?/ আজহার মাহমুদ

৩৫ ডাকটিকিটে বঙ্গবন্ধু/ বিনয় দত্ত

৩৯ যে রেকর্ড শুধু বঙ্গবন্ধু পরিবারেরই
মেজবাউল হক

৪১ বঙ্গবন্ধু দ্বীপ/ রাজিউর রহমান

৪৮ যুদ্ধযন্ত্রণার প্রতীক: শান্তিসারস হাতে সেই
সাদাকো সাসাকি/ জাহিদ রিপন

৫২ কবিগুরুর প্রথম ও শেষ!/ তপন মুৎসুদ্দী

৫৩ আমার দেখা কবি নজরুল/ হারুন-উজ-জামান

৫৬ রংধনু খাবারের গল্প/ শাহিদা সুলতানা

৫৯ অর্কর বদলে যাওয়া/ মৌমিতা ধর লোপা

৬০ বজ্রপাত/ আব্দুস সালাম

৬৭ শিক্ষা বাতায়ন/ শাহানা আফরোজ

৬৯ থাকি নিরাপদ, সাবধানে/ মো. জামাল উদ্দিন

৭১ চন্দ্র জয়ের ৫০ বছর: পুরস্কৃত খুদে
জোতির্বিজ্ঞানীরা/ তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

৭২ কন্যাশিশুর সাফল্য/ জান্নাতে রোজি

৭৩ দশদিগন্ত/ সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

৭৮ বুদ্ধিতে ধার দাও/ নাদিম মজিদ

গল্প

২২ খোকার চশমা/ রফিকুর রশীদ

৩১ একটি জাদুঘরের স্বপ্ন/ মনি হায়দার

৫০ নকল নয়, আসল/ ভাষান্তর: খায়রুল আলম সবুজ

৬৩ ভাষা-দাদুর সঙ্গে: বাংলা ভাষার বংশ
তারিক মনজুর

৬৫ ক... বলে ওঠে কাক/ মো. রহমত উল্লাহ্

কবিতা

০৪ সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল

১১ লুৎফর রহমান রিটন

১৪ সুজন বড়ুয়া

১৫ ওয়াসিফ-এ-খোদা/ জায়আন ইফতেখার

১৬ আহসানুল হক/ মোহাম্মদ ইলইয়াছ

১৭ জাহাঙ্গীর আলম জাহান

২৮ নিশি হোসেন

৩০ লাবিবা তাবাস্‌সুম রাইসা

৪৫ শেখ সালাহউদ্দীন

৪৬ সরদার আবুল হাসান/ বোরহান মাসুদ

৪৭ মো. ফেরদৌস সিদ্দিকী

৫৮ নাহার আহমেদ/ ইশরা হোসেন

৬১ হালিমা খাতুন বাবুনী

৭০ গোপেশচন্দ্র সূত্রধর

স্মৃতি গাথা

৪২ এক কিশোরী মুক্তিযোদ্ধা
লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির

নবারুণ পত্রিকার ফেসবুক পাতায় (Nobarun Potrika) আপলোডেড পত্রিকা পড়তে পারবে। এছাড়া চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তরের ওয়েবসাইট www.dfp.gov.bd-এর প্রকাশনা অংশ থেকে নবারুণ ডাউনলোড করা যাবে।

মোবাইলে নবারুণ পত্রিকা পড়তে চাইলে যে-কোনো স্মার্ট ফোনে গুগল প্লে স্টোরে গিয়ে Nobarun লিখলেই নবারুণ মোবাইল অ্যাপ-এর আইকন আসবে। অ্যাপটি ডাউনলোড করে নিলেই প্রতিটি সংখ্যা পড়তে পারবে একদম সহজে।

সংগীত

৬৬ বাংলার সম্মান/ কথা ও সুর ড. খান আসাদুজ্জামান

ছোটোদের লেখা

৪৫ মুক্তিযুদ্ধের কথা/ শ্রেয়সী মুসাররাত
৬২ দাদু বাড়িতে/ শেহ্‌জাদী ফারহা অর্থি

আঁকা ছবি

দ্বিতীয় প্রচ্ছদ: আয়ান হক ভূঁঞা/ রাইসা হোসাইন অর্না
শেষ প্রচ্ছদ: জান্নাতুল নাইমা
০১ বিন্তি প্রতিকা
০৯ জোহাইনা হায়দার
১০ আনুশেহ প্রতিভা
১১ বিন্দি পুষ্পিকা
১২ বিন্নি হিমিকা
১৪ পড়শি চক্রবর্ত্তী পর্ণা
১৬ তাজরিন হক
১৭ মুহাইমিন সরফরাজ
২১ সাদাকাত আরহান চৌধুরী
৩৮ ফাতেম জান্নাত অনিন্দিতা
৫৩ ইউসুফ হায়দার আদিব
৬১ মুহতাসিম আরিখ কাঙ্খিত
৭৫ সাজনিন আসমা (ইস্পা)/ সিদরাতুল মুনতাহা,
৭৬ মো. আহনাফ সিদ্দিক/ তাহমিদ আজমাঈন আহনাফ
৭৭ ফারিয়া সাবরিন/ আরিসা আদিবা

ঈদুল আজহার আনন্দ মাতিয়ে রাখুক সবাইকে। নবারুণের পক্ষ থেকে সবাইকে জানাচ্ছি ঈদ মোবারক। এই উপলক্ষে

পড়ো পৃষ্ঠা ২৯

বঙ্গবন্ধুর ঈদ কেমন ছিল?

ফেসবুক মতামত

Liaquat Khan: প্রতিটি প্রচ্ছদ আমার সময়ের চেয়ে ভালো হচ্ছে। আমি নতুন শিল্পীদের কাজ করার প্রশিক্ষণ ও সুযোগ দিয়েছিলাম। তার সুফল সম্পাদক লিপি কাজে লাগাতে পারছে দেখে ভালো লাগছে। মোস্তাফা সাহেবের অবসর একটা শূন্যতা সৃষ্টি করবে এই আশঙ্কা আর নেই। নবারুণের ভালো প্রচ্ছদ ও লেখার জন্য লিপি ও লিপির টিমকে ধন্যবাদ।

নবারুণ: স্যার অনেক ধন্যবাদ আমাদের সবাইকে উৎসাহিত করার জন্য। আপনার যে-কোনো পরামর্শ আমাদের কাম্য।

মিনহাজ উদ্দীন শরীফ: লেখা পাঠানো যাবে কী?

নবারুণ: নবারুণ একটি নিয়মিত পত্রিকা। মাসভিত্তিক আমাদের পত্রিকায় লেখাগুলো দুইমাস আগেই অনুমোদন প্রাপ্ত হয়ে পাণ্ডুলিপি আকারে তৈরি হয়ে যায়। তাই মাসভিত্তিক লেখাগুলো ঐ মাসের কমপক্ষে তিনমাস আগে পাঠাতে হবে।

Nurullah Raj: আমি ই-মেইলে একটি লেখা পাঠিয়েছি। তো, তা পেজে দেখা যাবে কখন?

নবারুণ: নবারুণ একটি কিশোর মাসিক পত্রিকা। আপনার লেখাটি শিশু-কিশোরদের জন্য উপযোগী ও মানসম্মত হলে অবশ্যই ছাপানো হবে।

Abir Akash: লেখা কী অভ্র ফন্টে-এ আইডির মেসেঞ্জার পাঠাতে পারি? ই-মেইল ঠিকানা?

নবারুণ: SutonnyMJ ফন্টে হলে ভালো হয়। লেখা পাঠানোর ই-মেইল ঠিকানা: editornobarun@dfp.gov.bd

সাইফুল্লাহ সাদী: নবারুণ কোথায় পাব?

নবারুণ: নবারুণ সারা দেশে তথ্য অফিসের মাধ্যমে শিশু-কিশোরদের কাছে পৌঁছায়। এছাড়া কোনো এলাকায় কার কাছ থেকে পাওয়া যাবে জানতে ম্যানেজার এর সাথে ০১৫৫২৩৭৫৬৮৮-এ নাম্বারে যোগাযোগ করুন।

নবারুণ পড়ুন: ওয়েবসাইট: www.dfp.gov.bd
ফেসবুক: Nobarun Potrika
App: নবারুণ Mobile App

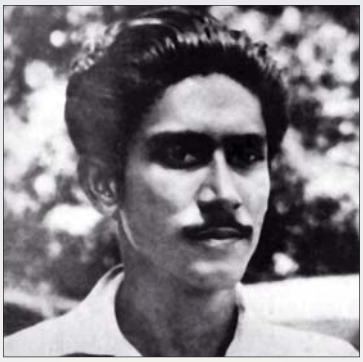

নামতা

সাইফুল্লাহ মাহমুদ দুলাল

একে একে এক
এ দেশটাকে করল স্বাধীন
শেখের বেটা শেখ।

দুই একে দুই
বাংলা ভাষা, বীর বাঙালি
স্বাধীন বঙ্গ-ভূঁই।

তিন একে তিন
শেখ মুজিবের কাছে সবার
আছে অনেক ঋণ।

চার একে চার
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু
সবার অহংকার!

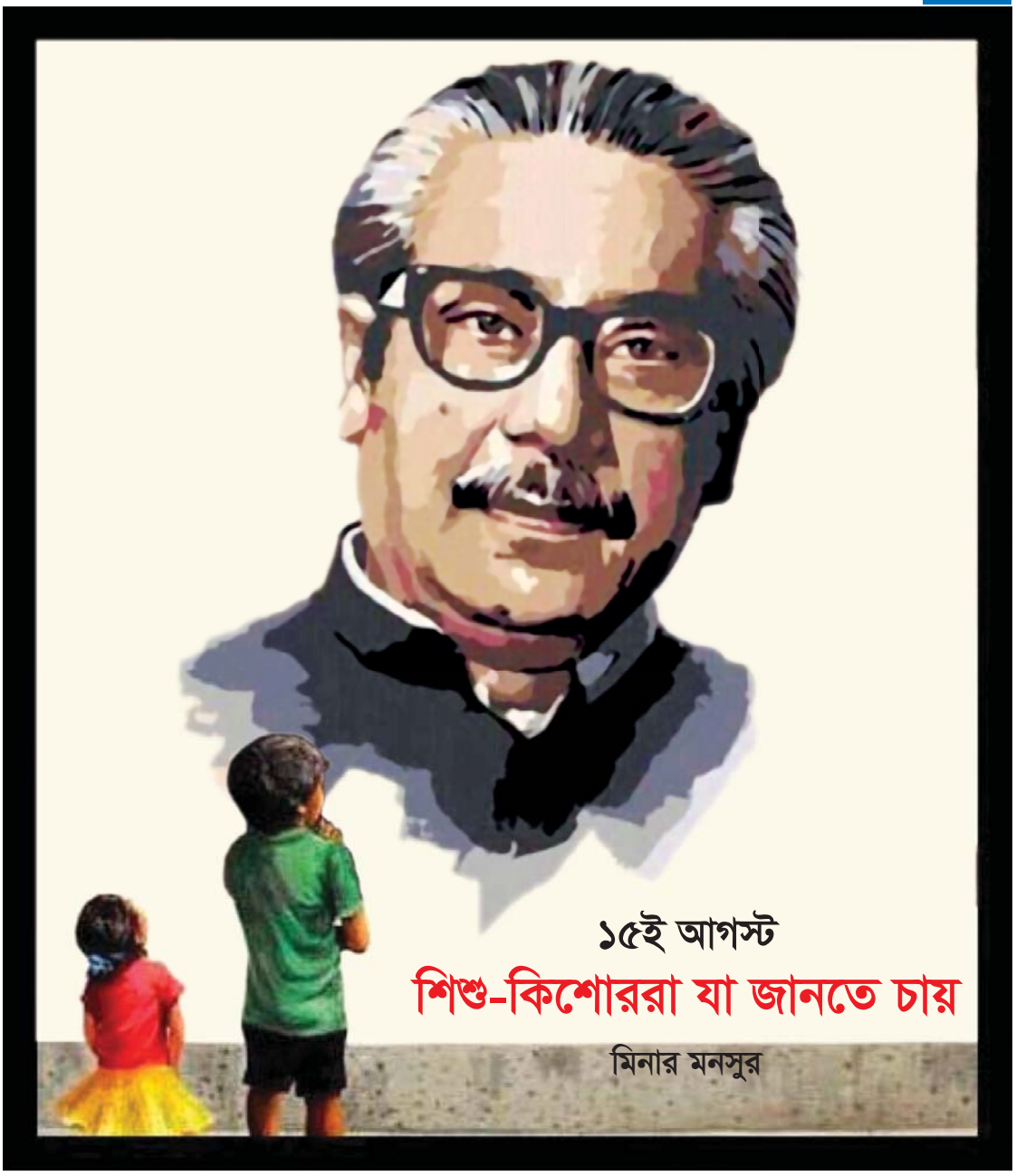

১৫ই আগস্ট
শিশু-কিশোররা যা জানতে চায়

মিনার মনসুর

আমাদের ছেলে অদম্যর বয়স এখন ১৪। যখন ওর বয়স ৫ বছর তখনই একদিন সকালে নাশতার টেবিলে ও আচমকা প্রশ্ন করে বসেছিল–'বাবা, বঙ্গবন্ধুকে ওরা কেন মেরেছিল?' এমন প্রশ্নের জন্যে আমরা তৈরি ছিলাম না মোটেও। তাই একটু থতোমতো খেয়ে গিয়েছিলাম সেদিন। এও উপলব্ধি করেছিলাম যে, ৫ বছরের একটি বাচ্চাকে বিষয়টি বোঝানো মোটেও সহজ নয়। তবু তার কাছে বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্যে আমরা যথাসাধ্য চেষ্টা করেছি।

বঙ্গবন্ধুকে ওরা কেন মেরেছিল?

কিন্তু তাতে অদম্য পুরোপুরি সন্তুষ্ট হতে পারেনি। যত দিন যায় ওর প্রশ্নের তালিকাও তত দীর্ঘ হতে থাকে। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। বঙ্গবন্ধুকে কারা মেরেছে– এ প্রশ্নের উত্তরে আমরা যখন বলি যে, যারা বাংলাদেশের স্বাধীনতা চায়নি তারাই তাঁকে হত্যা করেছে। তখনই সে পালটা প্রশ্ন করে বসে, 'কেন মেরেছে?' আমরা বলি, বঙ্গবন্ধু বাংলাদেশ স্বাধীন করেছেন তাই। -'তাহলে রাসেলকে মারল কেন? ও তো কিছু করেনি?' আমার মা তখন জীবিত ছিলেন। অদম্যর এসব প্রশ্ন শুনে তিনি হেসে বলতেন, তোরা ওর নাম 'অদম্য' রাখলি কেন? এখন তো ওকে দমানো যাবে না। আমরা হাসতাম।

যে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি হানাদারদের পরাজিত করেছে তারা তখন কী করেছে?

অদম্য হয়ত একটু অন্যরকম। ওর কৌতূহলের ধরনও হয়ত আর দশটা শিশুর চেয়ে আলাদা। তবে এসব প্রশ্ন যে অদম্যর একার নয় তা নিশ্চিতভাবে বলা যায়। আমার মেয়ে আলোকিতা– বয়সে অদম্যর চেয়ে ৫ বছরের বড়ো। দেশি-বিদেশি নানা বই পড়ে। জটিল সব বিষয় সহজ করে ভাবতে পারে। অথচ তারও সেই একই প্রশ্ন। অবশ্য তার প্রশ্নের পরিধি আরো ব্যাপক। তার প্রশ্ন হলো, বঙ্গবন্ধুকে যখন মারল, তোমরা তখন কী করেছ? যে মুক্তিযোদ্ধারা পাকিস্তানি হানাদারদের পরাজিত করেছে তারা তখন কী করেছে? কেন খুনিদের বিচারের জন্যে বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হলো? তারা যদি বন্দুক হাতে জাতির পিতাকে হত্যা করতে পারে, শিশু হত্যা করতে পারে, সন্তানসম্ভবা নারী হত্যা করতে পারে, তা হলে তোমরা কেন তাদের ধরে গাছের ডালে কিংবা ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে দাওনি? আলোকিতার ইচ্ছে ও ব্যারিস্টার হবে। ভাবী এ-ব্যারিস্টারের ক্রমাগত জেরার মুখে অপরাধীর মতো আমরা মাথা নত করে থাকি।

আসলে প্রশ্নগুলো শুধু অদম্য কিংবা আলোকিতার নয়; বঙ্গবন্ধুর নৃশংস হত্যা পরবর্তী গত প্রায় সাড়ে চার দশকে যাদের জন্ম হয়েছে, সেইসব শিশু-কিশোর-তরুণ-যুবক সবার মনেই লঘুচাপের মতো ঘুরপাক খাচ্ছে এইসব প্রশ্ন। হয়ত একদিন তা ঘূর্ণিঝড়ের মতো প্রকম্পিত করবে সমগ্র জনপদ। কারণ সেইসব প্রশ্নের সন্তোষজনক জবাব আজও তারা পায়নি। জবাব দেওয়ার গুরুদায়িত্বটি যাদের ওপর অর্পিত ছিল– সেই রাষ্ট্র, সেই সুশীল সমাজ, সেই নেতৃত্ব তা পালনে অনেকাংশে ব্যর্থ হয়েছেন। কেন ব্যর্থ হয়েছেন– তার উত্তর খুঁজতে গেলে হয়ত 'লোম বাছতে কম্বল উজাড়' হওয়ার মতো অবস্থা হবে। জীবনানন্দ দাশের ভাষায় বলতে হয়, 'কে হায় হৃদয় খুঁড়ে বেদনা জাগাতে ভালোবাসে?'

বঙ্গবন্ধুকে যখন মারল, তোমরা তখন কী করেছ?

উত্তর সন্ধানের চেষ্টা যে হয়নি তা নয়। তারমধ্যে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ পদক্ষেপটি ছিল বঙ্গবন্ধু হত্যার বিচার। দীর্ঘ সময় নিয়ে এ বিচারের কাজ চলেছে। অদম্য, আলোকিতারা যে প্রশ্নের উত্তর জানতে চায় এবং যে প্রশ্নের সদুত্তর পাওয়ার জন্যে পঁচাত্তরের সেই ভয়াল রাত্রির পর থেকে বাংলাদেশ বিনিদ্র ব্যাকুল অপেক্ষার প্রহর গুনছে, মাননীয় আদালতকেও অনিবার্যভাবে সেইসব প্রশ্নের মুখোমুখি হতে হয়েছে। তাঁরা সাক্ষীদের বক্তব্য শুনেছেন। দলিল-দস্তাবেজ দেখেছেন। রাষ্ট্রপক্ষের কৌসুলিদেরও মূল চ্যালেঞ্জ ছিল আদালতের সামনে উপযুক্ত তথ্যপ্রমাণের মাধ্যমে প্রশ্নগুলোর সন্তোষজনক উত্তর উত্থাপন করা। বিচার শেষ হয়েছে। ঘাতকদের শাস্তি হয়েছে। সাজাও কার্যকর হয়েছে কয়েকজনের। কিন্তু অদম্য-আলোকিতারা কি তাদের প্রশ্নের উত্তর পেয়েছে? বিনা দ্বিধায় বলা যায় যে– না, তারা উত্তর পায়নি।

উত্তর দেওয়ার মূল দায়িত্বটি ছিল রাষ্ট্রের। কিন্তু এ বর্বর হত্যাযজ্ঞ যখন সংঘটিত হয় রাষ্ট্র তখন সেই দায়িত্ব পালন তো করেই নি, বরং খুনিদের নিরাপদে দেশত্যাগে সহায়তা করেছে। বিদেশে তাদের বিলাসবহুল জীবনযাপনের যাবতীয় খরচ জুগিয়েছে।

সরকারি পদ-পদবি-পদোন্নতি শুধু নয়, সর্বোচ্চ সুরক্ষাও দিয়েছে। যতভাবে তাদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দেওয়া যায় সবই করেছে রাষ্ট্র। এমনকি ইনডেমনিটি বা দায়মুক্তি অধ্যাদেশ জারী করে তাদের বিচারের পথও রুদ্ধ করে দিয়েছিল রাষ্ট্রের তৎকালীন দণ্ডমুণ্ডের কর্তারা। বঙ্গবন্ধু হত্যার ৭৯ দিনের মধ্যে কারাগারের অভ্যন্তরে জাতীয় চার নেতাকে যে কাপুরুষোচিত পন্থায় হত্যা করা হয়েছে তার নেপথ্যেও ছিল রাষ্ট্রের নজিরবিহীন ইন্ধন।

মুখ রক্ষার খাতিরে হয়ত বলা যায় যে তখন এ রাষ্ট্র তো ছিল ঘাতকদের দখলে। সপরিবারে বঙ্গবন্ধুকে হত্যার পর চিহ্নিত খুনিরা বঙ্গভবন দখল করে রেখেছিল এটা সত্য। কিন্তু সেটার স্থায়িত্ব ছিল মাত্র তিনমাস। তাহলে ঘাতক হিসেবে যাদের সাজা হয়েছে তারা পালিয়ে যাওয়ার পর দীর্ঘ ২১ বছর যারা রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা দখল করে রেখেছিল, ঘাতকদের আশ্রয়-প্রশ্রয় দিয়েছিল, বঙ্গবন্ধুর নাম মুছে ফেলার চেষ্টা করেছিল, বিচারের পথ রুদ্ধ করে রেখেছিল এবং সর্বোপরি বাংলাদেশের নাম-পরিচয় ও আদর্শ পর্যন্ত বদলে ফেলার চেষ্টা করেছিল– তারা কারা? তাদের বিচারের কাঠগড়ায় দাঁড় করানো হলো না কেন? কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা হঠাৎ সিদ্ধান্ত নিয়ে জাতির পিতা ও দেশের রাষ্ট্রপতিকে খুন করে ফেলল-এ কি বিশ্বাস করা যায়?

রাষ্ট্র মানে তো মধ্যম পর্যায়ের কয়েকজন সেনা কর্মকর্তা নয়। বিমানবাহিনী, নৌবাহিনী ও সেনাবাহিনীর সমন্বয়ে গঠিত গোটা সশস্ত্রবাহিনী তখন কী করেছে? মর্যাদাজনক এ প্রতিষ্ঠানের কমান্ড বা নেতৃত্ব যাদের হাতে ছিল– তারাই বা কী করেছেন? প্রশাসন, রক্ষীবাহিনী এবং পুলিশের ভূমিকাই বা কী ছিল? কতিপয় উচ্ছৃঙ্খল সেনা কর্মকর্তার হাতে দেশের রাষ্ট্রপতি নিহত হয়েছেন, কিন্তু গোটা রাষ্ট্র তো ছিল। ছিল সংবিধান। সেই সংবিধানে স্পষ্টভাবে বলা আছে যে, এ ধরনের অস্বাভাবিক পরিস্থিতিতে রাষ্ট্রের কী করণীয়। রাষ্ট্রের শীর্ষ কর্মকর্তারা কি সংবিধানের সেই নির্দেশ পালন করেছিলেন? যদি না করে থাকেন তাহলে তার দায় তারা এড়াবেন কীভাবে? এসব অতি জরুরি প্রশ্নের উত্তর মেলেনি আজও। অনেকে হয়ত বলতে পারেন যে বিচার বিভাগও তো রাষ্ট্রের অঙ্গ। বিলম্বে হলেও তাঁরা তো তাদের দায়িত্ব পালন করেছেন। কিন্তু আমাদের জিজ্ঞাসা হলো, যখন দেশের বৈধ রাষ্ট্রপতিকে হত্যা করা হলো এবং পদদলিত করা হলো সংবিধানকে– তখন রাষ্ট্র তার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালন করেছে কিনা। যদি না করে থাকে সে জন্যে জাতির কাছে তাদের জবাবদিহি করতে বাধ্য করা হলো না কেন?

তাহলে রাসেলকে মারল কেন? ও তো কিছু করেনি?

সংবিধান অনুযায়ী, সকল ক্ষমতার মালিক হলো জনগণ। রাষ্ট্র বা সরকার সংবিধানের নির্দেশমতে জনগণের পক্ষে দায়িত্ব পালন করে মাত্র। অতএব, রাষ্ট্র যখন তার সাংবিধানিক দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয় তখন জনগণকে এগিয়ে আসতে হয়। লাগাম টেনে ধরতে হয় রাষ্ট্রের। জনগণের পক্ষে বা জনগণের প্রতিনিধি হিসেবে সকল সমাজেই জ্ঞানী-গুণী ও বিবেকবান মানুষেরা এ দায়িত্বটি পালন করে থাকেন। তাই জাতির বিবেক হিসেবেও অভিহিত করা হয়ে থাকে তাদের। উন্নত দেশগুলোতে তারা 'সিভিল সোসাইটি' (Civil Society) নামে পরিচিত হলেও আমাদের দেশে কীভাবে যেন তা 'সুশীল সমাজ' অভিধা পেয়েছে। নাম যাই-ই হোক, যুগে যুগে দেশে দেশে রাজা বা রাষ্ট্রের অবিমৃশ্যকারিতার বিরুদ্ধে তারাই বিবেকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। সত্য ও ন্যায়ের পক্ষাবলম্বন করতে গিয়ে জীবনও দিয়েছেন অনেকে। উদাহরণ হিসেবে আমাদের শহিদ বুদ্ধিজীবীদের প্রসঙ্গ উত্থাপন করা যায়। প্রতিবাদের উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত হিসেবে এখনও যিনি বিশ্বাকাশে নক্ষত্রের মতো দীপ্যমান তিনি হলেন কিউবার নেতা ফিডেল ক্যাস্ট্রো। তাঁর দেশে সামরিক জান্তা যখন সংবিধান পদদলিত করে ক্ষমতা দখল করেছিল– তখন প্রথমে তিনি আদালতের শরণাপন্ন হয়েছিলেন। কিন্তু বন্দুকের ভয়ে আদালত যখন তাঁর দায়িত্ব পালনে অপারগতা প্রকাশ করেন তখন তিনি সশস্ত্র বিদ্রোহের পথে পা বাড়িয়েছিলেন। এ ধরনের উদাহরণ অনেক।

কিন্তু গ্লানি ও লজ্জার বিষয় হলো, জাতির সেই

কেন খুনিদের বিচারের জন্যে বছরের পর বছর অপেক্ষা করতে হলো?

দুর্যোগময় মুহূর্তে আমাদের সুশীল সমাজের একটি অংশ সরাসরি খুনিদের পক্ষাবলম্বন করেছিলেন। ঘাতকদের অনুগ্রহ লাভের জন্যে পঁচাত্তরের ১৫ই আগস্টেই কেউ বেতার ভবনে, কেউবা বঙ্গভবনে ছুটে গিয়েছিলেন। বাঙালির ইতিহাসের নিকৃষ্টতম এ ঘাতকদের 'সূর্যসন্তান' অভিহিত করেই ক্ষান্ত হননি তারা, প্রবন্ধ-কবিতা-গানও রচনা করেছেন তাদের নিয়ে। পত্রপত্রিকায় তা প্রকাশিত হয়েছে। প্রচারিত হয়েছে বেতার-টেলিভিশনে। ঘাতক এবং তাদের পৃষ্ঠপোষকদের মন্ত্রী-উপদেষ্টাও হয়েছেন অনেকে। তথাকথিত এ সুশীলদের সেই নির্লজ্জ নির্বিবেক ভূমিকা এখন আরো কদর্য রূপ নিয়েছে। কত কিছুর জন্যেই না তারা মাতম করেন প্রতিদিন! কিন্তু স্বাধীন দেশে যে কারবালা সংঘটিত হলো, যেভাবে জাতির পিতাকে সপরিবারে হত্যা করা হলো এবং শিশু ও গর্ভবতী নারীর রক্তে রঞ্জিত করা হলো জাতির ললাট– তা নিয়ে তারা টু শব্দটিও করেন না।

এ কথা অনস্বীকার্য যে কবি-শিল্পী-সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীদের একটি উল্লেখযোগ্য অংশ বঙ্গবন্ধু হত্যার প্রতিবাদে সোচ্চার হয়েছিলেন। তারাই প্রথম প্রজ্বলিত করেছিলেন প্রতিবাদের মশাল। উদাহরণ হিসেবে কবি নির্মলেন্দু গুণের অবিস্মরণীয় কয়েকটি কবিতার কথা বলা যায়। যেমন– 'আমি আজ কারো রক্ত চাইতে আসিনি', 'সেই রাত্রির কল্পকাহিনী', 'স্বাধীনতা, এই শব্দটি কীভাবে আমাদের হলো' প্রভৃতি। পঁচাত্তর পরবর্তীকালে লেখা এসব কবিতা জনচিত্তে যে অভিঘাত সৃষ্টি করেছিল– তার আলোড়ন কখনোই থামবার নয়। একইভাবে বলা যায়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সূর্যতরুণ গোষ্ঠীর উদ্যোগে প্রকাশিত 'এ লাশ আমরা রাখবো কোথায়', চট্টগ্রামের এপিটাফ প্রকাশনী থেকে প্রকাশিত 'শেখ মুজিব একটি লাল গোলাপ' কিংবা 'আবার যুদ্ধে যাবো'-এর কথাও। সেই অন্ধকারে বাতিঘরের মতো কাজ করেছিল এসব কবিতা ও প্রকাশনা। সেই আলো ছড়িয়ে পড়েছিল সারা দেশে। অচিরেই পহেলা বৈশাখ ও একুশে ফেব্রুয়ারির মতো পনেরোই আগস্টও পরিণত হয়েছিল প্রতিবাদী কবি-শিল্পী-সাহিত্যিকদের প্রেরণা ও সৃষ্টিশীলতার এক অশেষ ঝরনাধারায়। শোক পরিণত হয়েছিল শক্তিতে। শুধু তাই নয়, যত দিন যাচ্ছে ততই তা আরো বেগবান হচ্ছে।

এ কথা সত্য যে ইতোমধ্যে প্রাতিষ্ঠানিক-অপ্রাতিষ্ঠানিকভাবে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বহু প্রকাশনা হয়েছে। বিশেষ করে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ ব্যাপক মাত্রা ও গতি পেয়েছে। বঙ্গবন্ধু জাদুঘর, বাংলা একাডেমি ও শিশু একাডেমিসহ বিভিন্ন সরকারি প্রতিষ্ঠান থেকে বেশকিছু বই ও সংকলন প্রকাশিত হয়েছে। এর মধ্যে তাৎপর্যপূর্ণ দুটি উদ্যোগ হলো, ইউপিএল থেকে প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধুর অসমাপ্ত আত্মজীবনী' এবং বাংলা একাডেমি থেকে দুই খণ্ডে প্রকাশিত 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান জীবন ও রাজনীতি'। তারপরও প্রশ্ন থেকে যায়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নটি হলো, অদম্য-আলোকিতারা যে-সব প্রশ্নের উত্তর জানতে চায়– এসব গ্রন্থে কি সেই সব প্রশ্নের উত্তর আছে? আমি সবিনয়ে বলতে চাই যে– নেই। আমার এ মন্তব্যে কেউ কেউ হয়ত অসন্তুষ্ট ও ক্ষুব্ধ হতে পারেন– এ ব্যাপারে আমি সচেতন। তা সত্ত্বেও আমি বিষয়টির ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ

তারা যদি বন্দুক হাতে জাতির পিতাকে হত্যা করতে পারে, শিশু হত্যা করতে পারে, সন্তানসম্ভবা নারী হত্যা করতে পারে, তা হলে তোমরা কেন তাদের ধরে গাছের ডালে কিংবা ল্যাম্পপোস্টে ঝুলিয়ে দাওনি?

করার তাগিদ অনুভব করছি। এর যৌক্তিক কারণও রয়েছে।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগে যত বই প্রকাশিত হয়েছে তা যে পরিমাণে ও পৃষ্ঠা সংখ্যার বিচারে বিপুল তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। এতে যে পরিমাণ তথ্য সন্নিবেশিত হয়েছে সেগুলো জড়ো করে কয়েকটি মহাকাব্যও হয়ত রচনা করা যাবে। কিন্তু আজকের অতি ব্যস্ত প্রযুক্তিনির্ভর শিশু-কিশোর-তরুণরা যেভাবে তথ্যগুলো জানতে চায় সেভাবে সেগুলো সেখানে উপস্থাপিত হয়নি। মনে রাখা দরকার যে, স্কুল-কোচিং-সেমিস্টার এবং কারিকুলাম বহির্ভূত নানারকম কোর্সের চাপে তারা এমনিতেই বিপর্যস্ত। তারপর যেটুকু সময় তারা পায় সেটা ব্যয় করে প্রধানত টেলিভিশন, ট্যাব, স্মার্টফোন, কম্পিউটারসহ প্রযুক্তিনির্ভর যে বিশাল মায়াবী জগৎ– তার পেছনে। প্রযুক্তির নিত্যনতুন উদ্ভাবন যেভাবে তাদের নিদ্রা হরণ করে নিচ্ছে, রূপকথার জগৎও পূর্ববর্তী প্রজন্মকে ততটা আলোড়িত করতে পারেনি। অতএব, তাদের মনোজগতে প্রবেশ করতে হলে এ বাস্তবতা যেমন বিবেচনায় রাখতে হবে, তেমনি তাদের রুচি বা মানসিক গঠনটিও বিস্মৃত হলে চলবে না। এ ক্ষেত্রে এখনও বড়ো ধরনের শূন্যতা রয়ে গেছে বলে আমার মনে হয়েছে।

এটা সুবিদিত যে তথ্যের উপস্থাপনা বা পরিবেশনার গুরুত্ব অপরিসীম। শুধু পরিবেশনার গুণেই একটি তথ্য বা বক্তব্য জনচিত্তে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করতে পারে। উদাহরণ হিসেবে বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ভাষণকে হাজির করা যেতে পারে। স্বাধীনতার ঘোষণা নিয়ে কতজন কত কথাই তো বলেছেন এবং বলছেন। কিন্তু বঙ্গবন্ধুর সেই ভাষণের যে আবেদন, দীর্ঘ ৪৩ বছর পরেও তা এতটুকু মলিন হয়নি। শত বছর পরেও যে হবে না– তাও নিঃসন্দেহে বলা যায়। আবার পরিবেশনার দুর্বলতার কারণে অনেক গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্যও যে বুদবুদের মতো বিনা আলোড়নেই হাওয়ায় মিলিয়ে যেতে পারে– তার উদাহরণও অঢেল। সে জন্যেই উন্নত দেশগুলোতে তথ্য ও বক্তব্য উপস্থাপনের রীতি ও কৌশল নিয়ে ব্যাপক গবেষণা চলে আসছে দীর্ঘদিন যাবৎ। এ ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয় টার্গেট গ্রুপ অর্থাৎ যাদের জন্যে তথ্য বা বক্তব্যটি উপস্থাপিত হচ্ছে তাদের রুচি ও মনমানসিকতার ওপর। এখানে বলা প্রয়োজন যে উপস্থাপনার বিষয়টি আসে পরে। সবার আগে নির্ধারণ করতে হয় বক্তব্য। আমরা কী বলব সে বিষয়ে ধারণা স্বচ্ছ না হলে উপস্থাপনা যত ভালোই হোক তা বিফলে যেতে বাধ্য। ধারণা স্বচ্ছ করার সহজ উপায়টি হলো– আমরা যে বিষয়ে বক্তব্য উপস্থাপন করতে চাই সে

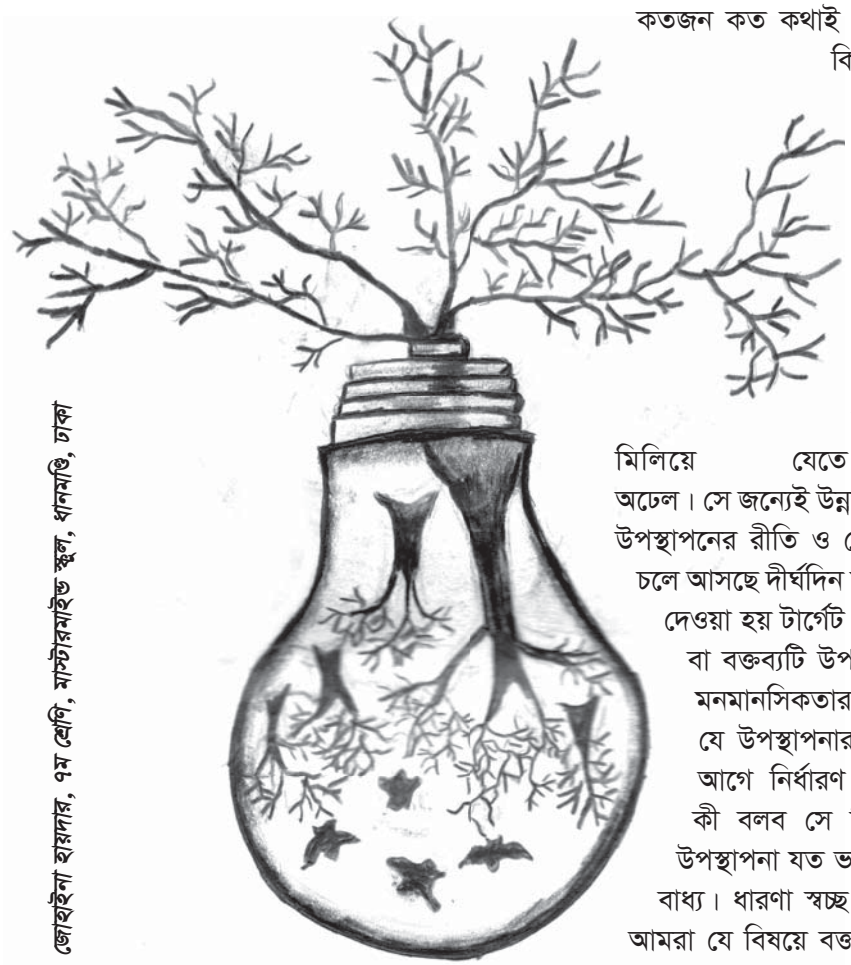

জোহাইনা হায়দার, ৭ম শ্রেণি, মাস্টারমাইন্ড স্কুল, ধানমন্ডি, ঢাকা

আনুশেহ প্রতিভা, ষষ্ঠ শ্রেণি, উদয়ন স্কুল, ঢাকা

বিষয়ে জনমনে বিরাজমান প্রশ্নগুলোকে সামনে রাখা। আজকাল নামিদামি বহু প্রতিষ্ঠান তাদের ওয়েবসাইটে 'এফএকিউ' (ফ্রিকোয়েন্টলি আস্কড কোয়েশ্চেন্‌স) নামে একটি মেন্যু সংযোজন করে থাকে। ব্যাপক ও ব্যয়বহুল জরিপের মাধ্যমে এ প্রশ্নগুলো তুলে আনা হয় তাদের লক্ষ্যভুক্ত (টার্গেটেড) জনগণের ভেতর থেকে। সে অনুযায়ী বক্তব্যগুলো বিন্যস্ত করা হয়। বঙ্গবন্ধু হত্যাকাণ্ডকে ঘিরে অদম্য-আলোকিতাদের মনে যে প্রশ্ন পুঞ্জীভূত হয়ে আছে দীর্ঘদিন ধরে সেই প্রশ্নগুলোকে ছেঁকে তুলে আনার অতি জরুরি কাজটি। সঠিক ইতিহাস সঠিকভাবে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে হবে। জরুরিভিত্তিতে এদিকে বিশেষভাবে মনোযোগ দেওয়া দরকার।

মনে রাখা প্রয়োজন যে, আমাদের জনসংখ্যার একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হলো তোমরা, শিশু-কিশোর ও তরুণরা। সদিচ্ছা থাকলে তোমাদের যাবতীয় জিজ্ঞাসার যথাযথ উত্তরটি তোমাদের কাছে পৌঁছে দেওয়া কঠিন নয়। প্রথম কাজটি হলো, বঙ্গবন্ধুর হত্যাকাণ্ড বিষয়ে তোমরা সব সময় যে প্রশ্নগুলো করে থাক সেগুলো চিহ্নিত করা। দ্বিতীয় কাজটি হলো, তোমাদের রুচি ও মনমানসিকতা অনুযায়ী আকর্ষণীয়ভাবে তা উপস্থাপন করা। এ ক্ষেত্রে ছাপা ও ইলেকট্রনিক উভয় মাধ্যমই ব্যবহার করা যেতে পারে। লাখ লাখ শিশু-কিশোর-তরুণ প্রতিবছর স্কুল-কলেজে পা রাখছে। তাদের জানার আগ্রহ অসীম। অতএব, ক্ষেত্র প্রস্তুত আছে। এখন প্রয়োজন তাতে বীজ বপন এবং তার উপযুক্ত পরিচর্যা। আজকের শিশু-কিশোর ও তরুণরা, প্রশ্নের উত্তর জানার চেষ্টা অব্যাহত রেখো। তবেই সম্পূর্ণভাবে মূল্যায়িত হবেন জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান, ন্যায়বিচার নিশ্চিত হবে তাঁর প্রতি করা জঘন্য অন্যায়ের, বাংলাদেশ সত্যিকার অর্থে হয়ে উঠবে মুক্তিযুদ্ধের চেতনার রাষ্ট্র, মানবিক দেশ। জয় হোক প্রশ্নের। ■

মুজিবের থাকা না থাকা

লুৎফর রহমান রিটন

দেয়ালে দেয়ালে সারা দেশ জুড়ে লেখা ছিল তাঁর নাম
পুরনো দেয়াল সেই অজুহাতে করিয়েছি চুনকাম।
টিভির ফুটেজে সংরক্ষিত ছিল তাঁর যত ছবি
এডিট করেছি ইরেজ করেছি নষ্ট করেছি সবই।

ছোটোদের যত পাঠ্যসূচিতে লেখা ছিল তাঁর নাম
জ্ঞানপাপী কিছু লেখক জুটিয়ে সব ছেঁটে ফেললাম।
রেডিওতে ছিল তাঁকে নিয়ে গাওয়া কালজয়ী কিছু গান
ইরেজ করেছি নষ্ট করেছি গান হলো অবসান।

চলচ্চিত্রেও ছিল তাঁর ছবি, দিয়েছি বেজায় ঘষে
ভেবেছি মুজিব ইতিহাস থেকে চিরতরে গেছে খসে।
ইতিহাস থেকে মুজিবের নাম মুছে দিয়ে অতঃপর—
উল্লাসে মাতি-নেই নেই নেই, নেই সেই মুজিবর।

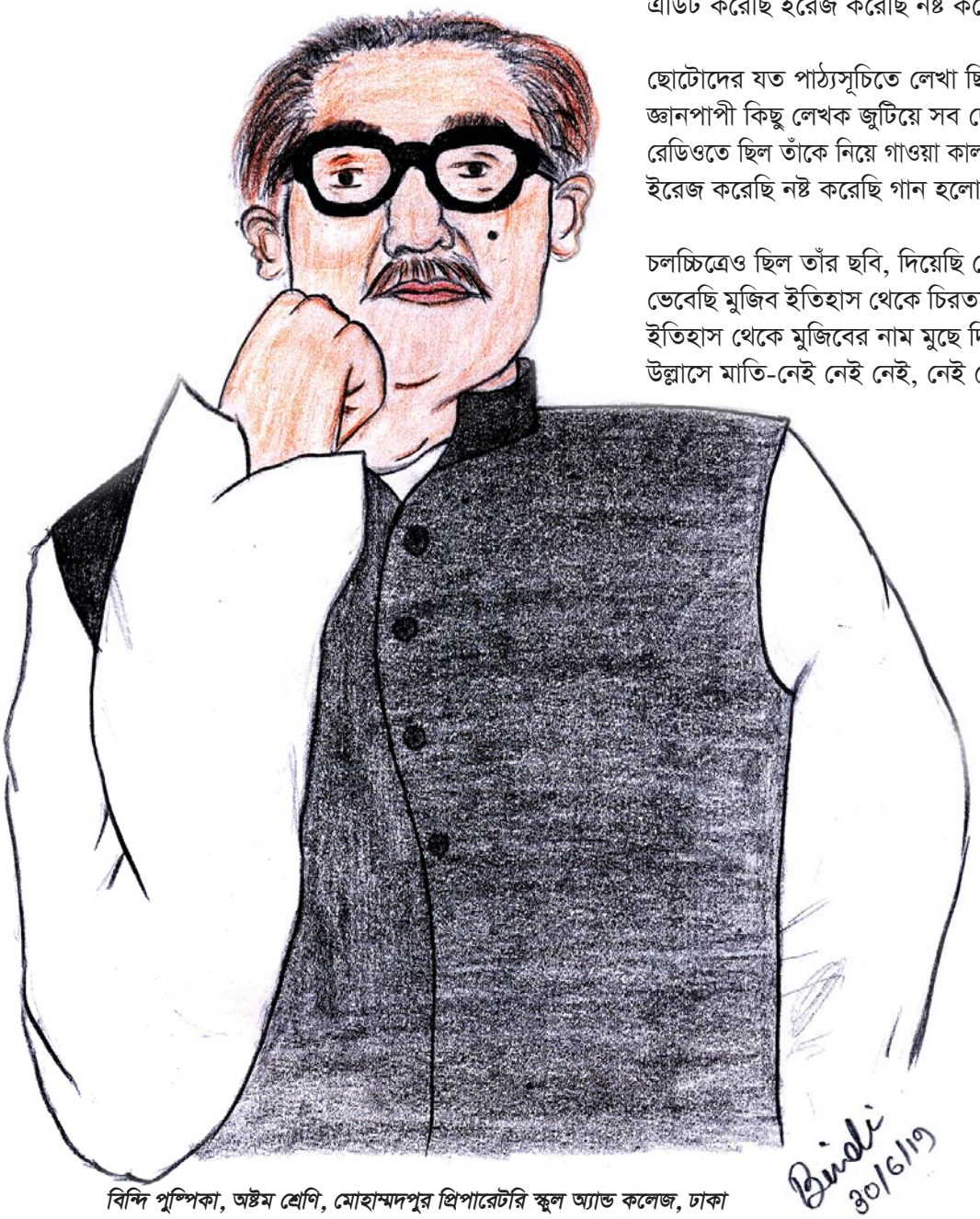

বিন্দি পুষ্পিকা, অষ্টম শ্রেণি, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

এত মুছলাম এত কাটলাম এত ঘষলাম তবু
এই বাংলায় মুজিবর নেই বলতে পারি না কভু।
এত কাটাছেঁড়া তবুও মুজিব কী করে সজীব রয়?
এই বাংলায় কারা অবিচল মুজিবের কথা কয়!

প্রকৃতির কাছে পাঠ নিতে নিতে অবশেষে জানলাম
এই বাংলার পরতে পরতে লেখা আছে তাঁর নাম!
যেদিকে তাকাই এই বাংলার মাটি আর আসমান
সবখানে দেখি মুজিবের ছায়া আর তাঁর জয়গান।

প্রতিদিন যেন সূর্যের নামে মুজিব উদিত হয়
প্রতিদিন যেন দখিনা বাতাস মুজিবের নামে বয়।
প্রতিদিন যেন মুজিবের নামে সহস্র ফুল ফোটে
মুজিবের নাম গান হয়ে ওঠে হাজারো পাখির ঠোঁটে।

প্রতিদিন যেন ভোরের শিশির মুজিবের নামে ঝরে
মুজিবের নামে টাপুরটুপুর অঝোরে বৃষ্টি পড়ে।
রাতের আকাশে মুজিব জোছনা, আকাশে মুজিব চাঁদ
নদী কলকলে ঝরনার জলে মুজিবের সংবাদ।

ফসলের মাঠে প্রতি মৌসুমে প্রতিটি শস্যকণা
মুজিবের যত কীর্তিকে নিয়ে করে শুধু আলোচনা।
কৃষকের চোখে হাসে মুজিবর নবান্ন উৎসবে
মুজিব মুখর শাপলার বিলে ডাহুকের কলরবে।

নৌকার পাল লাঙলের ফলা এবং ধানের শিষে
ঊর্মির ভিড়ে সমুদ্রতীরে মুজিবর আছে মিশে।
বটের ছায়ায় উদাসী দুপুরে রাখালের প্রিয় বাঁশি
সিম্ফনি তোলে-মুজিব তোমাকে ভালোবাসি ভালোবাসি।

মায়ের আঁচলে বোনের বেণিতে বাবার জায়নামাজে
অষ্টপ্রহর মুজিবর আছে সকল শুভর মাঝে।
কিষানি বধূর সন্ধ্যা প্রদীপে পড়ে মুজিবের ছায়া
নকশিকাঁথার বুননে বুননে মুজিবের যত মায়া।

বিন্নি হিমিকা, অষ্টম শ্রেণি, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

জারি সারি আর ভাটিয়ালি গানে মুজিবের যত কথা
মুজিবের প্রেমে নুয়ে পড়ে ঘাস লাজুক স্বর্ণলতা।
শরতের আকাশে সাদা সাদা মেঘ মুজিবের ছবি আঁকে
ধ্রুবতারা হয়ে মুজিবর আছে তারাদের ঝাঁকে ঝাঁকে।

বইয়ের মলাটে মুজিবর আছে কবিতার পঙ্‌ক্তিতে
ফেব্রুয়ারির প্রভাতফেরিতে নাটকে ও সংগীতে।
মুজিব মূর্ত চারুশিল্পীর বিমূর্ত ক্যানভাসে
বাংলার দুখে বাংলার সুখে মুজিবর কাঁদে, হাসে।

মিছিলে মিছিলে স্লোগানে স্লোগানে পোস্টারে ফেস্টুনে
লাল অক্ষর আরো লাল হয় মুজিবের তাজা খুনে।
শ্রমিকের ঘামে মজুরের শ্রমে শিশুদের সমাবেশে
উদ্দীপনার হিমালয় হয়ে মুজিব দাঁড়ায় এসে।

শিক্ষার্থীর মননে মেধায় মুজিবর জাগ্রত
ধ্বংসস্তূপে মুজিবর জাগে ফিনিক্স পাখির মতো।
লাখো শহিদের শোণিতপ্রবাহ মুজিবের পানে ধায়
জোনাকির আলো জ্বলে আর নেভে বিনম্র শ্রদ্ধায়।

দ্রোহে প্রতিবাদে প্রতিরোধে জেনো মুজিবর আছে কাছে
স্মৃতিসৌধ ও শহিদমিনারে মুজিবর মিশে আছে।
মুজিবর আছে বাংলাদেশের অপরূপ পতাকায়
মুজিবর আছে মানচিত্রের মায়াভরা আঙিনায়।

এদেশের কোটি মানুষের বুকে মুজিব নিয়েছে ঠাঁই
তিনি অবিনাশী অবিনশ্বর তাঁর বিনাশ নাই।

কবিতায়
বঙ্গবন্ধু

তুমিই বাংলাদেশ

সুজন বড়ুয়া

ইতিহাস শুরু যেভাবেই করি
যেভাবে করি না শেষ
বঙ্গবন্ধু তুমিই প্রথম
তুমিই বাংলাদেশ।

তোমার ডাকেই মুক্তিযুদ্ধ
তোমার ডাকেই জয়
তোমার মধ্যে বঙ্গোপসাগর
তোমাতেই হিমালয়।

তোমার মধ্যে সোনার বাংলা
পতাকা–প্রকৃতি সবই
তুমি যে সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি
ও রাজনীতির কবি।

তুমি উৎসব তুমি বিপ্লব
অবিরাম সংগ্রাম
রক্ত আখরে লিখলে বাংলা
ভাষা ও দেশের নাম।

তুমি বাংলার বাংলা তোমার
যেন এক পরিচয়
তোমার কারণে বাঙালি আজকে
বিশ্বের বিস্ময়।

তুমি নেই তবু আছ সবখানে
তুমি যে অনিঃশেষ
বঙ্গবন্ধু জাতির পিতা
তুমিই বাংলাদেশ।

পড়শি চক্রবর্তী পর্ণা, তৃতীয় শ্রেণি, নবীগঞ্জ শিবপাশা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, হবিগঞ্জ

মহানায়ক

ওয়াসিফ-এ-খোদা

মুক্তিযুদ্ধে প্রেরণা ছিল
বজ্রকণ্ঠ তোমার
ভাষণ সে এক মারণাস্ত্র
তুচ্ছ বুলেট বোমা...

ঘর ছেড়ে যায় যুদ্ধক্ষেত্রে
কৃষক–তাঁতি–শ্রমিক
শত্রুকে নিশ্চিহ্ন করতে
আঘাত হানে ক্রমিক;

গুমতি বড়ুয়া রোজারিও
জগৎ জ্যোতি ওহিদ
হাসতে হাসতে বিজয়ী হয়
হাসতে হাসতে শহিদ–

ওদের জন্য নিশ্চিত হয়
বিজয় মাতৃভূমির
মহানায়ক বঙ্গবন্ধু
শেখ মুজিবুর তুমি।

অমর কথামালা

জায়আন ইফতেখার

আমি বলি অমর কবিতা
বয়ে চলা নদী
সবুজ-শ্যামল প্রকৃতি
এ-এক সোনার বাংলা।
যতকাল এ আকাশে উঠবে চাঁদ
উঠবে সূর্য, পাখিরা গাইবে গান
ততকাল থাকবে তোমার নাম
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান
তুমিই আমাদের জাতির পিতা
মায়ের মমতা
তুমি এনেছ স্বাধীনতা।
তাই তো তোমার নাম লেখা
এ দেশের মানুষের হৃদয়ে।
স্বাধীন বাংলাদেশের অমর কবিতা তুমি।
কে বলেছে তুমি নেই?
তুমি আছ তুমি থাকবে চিরকাল।
যতদিন থাকবে এ পৃথিবী।
তোমার সোনার বাংলার বাকি কাজ করবে
এ প্রজন্ম, শিশু সন্তানেরা।

৬ষ্ঠ শ্রেণি, লাইসিয়াম হাই স্কুল।

বাংলাদেশের বক্ষ জুড়ে

আহসানুল হক

সেদিন ছিল মেঘলা আকাশ
ছিল শ্রাবণ মাস
বাঙালিদের ভাগ্যে ঘটে
গভীর সর্বনাশ !

স্বপ্ন ভেঙে হয় চুরমার
লীন হয়ে যায় আশ
মধ্যরাতে হঠাৎ গুলি
ঠুস্ ঠুস্ ঠুস্ ঠাস্ !

খুন হয়ে যান বঙ্গবন্ধু
রক্তমাখা লাশ
থমকে উঠে বিশ্ব বিবেক
রুদ্ধ যেন শ্বাস !

কাঁদে মানুষ কাঁদে নদী
কাঁদে ওরা নিরবধি
ফুল-পাখি ও ঘাস ;

শোক নিয়ে নেয় শক্তিতে রূপ
শত্রুরা সব নাশ
বাংলাদেশের বক্ষ জুড়ে
শেখ মুজিবের বাস !

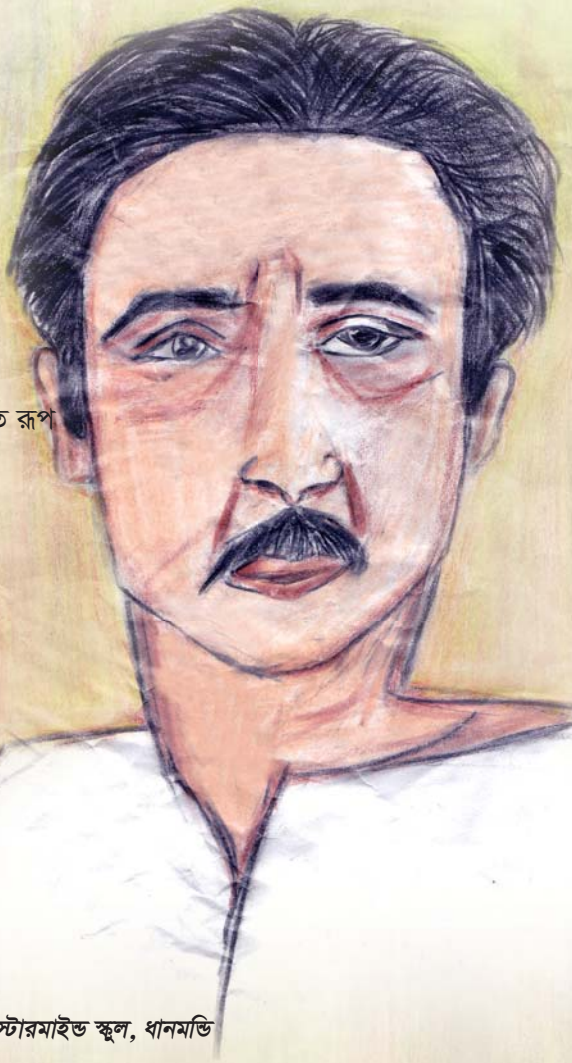

তাজরিন হক, ৮ম শ্রেণি, মাস্টারমাইন্ড স্কুল, ধানমন্ডি

মধুমতির পাড়ে

মোহাম্মদ ইলইয়াছ

মুজিব নামের ফুল ফুটেছে
মধুমতির পাড়ে,
সেই ফুলটি দেখে এলাম
টুঙ্গিপাড়ার ধারে।

ফুলের সুবাস ছড়িয়ে গেছে
বিশ্ব-ভুবনময়,
ফুলের নামে দেশ-জনতা
তাঁর নামটি কয়।

মুজিব নামের ফুল ফুটেছে
বাইগ্যা নদীর পাড়ে,
সেই ফুলকে দেখে এলাম
ঘাঘোর নদীর ধারে।

ফুলের সুবাস ছড়িয়ে গেছে
মাঠ-প্রান্তর হাসে,
সেই ফুলটি হৃদয় মাঝে
গভীর ভালোবাসে।

সে ফুলটি মুজিব নামের
সব মানুষের মিতা,
আকাশ জোড়া তাঁরই ছায়া
বাংলাদেশের পিতা।

রাসেল ছিল রাসেল আছে

জাহাঙ্গীর আলম জাহান

রাসেল-রাসেল বন্ধু রাসেল
রাসেল গেছে কই?
রাসেল ছিল রাসেল আছে
থাকবে অবশ্যই।
রাসেল আছে ফুলের গাছে
মুগ্ধ ফুলের ঘ্রাণে
তোমার মাঝে আমার মাঝে
সবার প্রাণে প্রাণে।

কোমলমতি রাসেল সোনার
প্রাণ নিয়েছে যারা
তাদের প্রতি দেয় যে লান্ত
খোদার ফেরেশতারা।
দূর আকাশে চাঁদের দেশে
ওই যে দেখো চেয়ে
রাসেল সোনা আসছে নেমে
মেঘের সিঁড়ি বেয়ে।

রাসেল-রাসেল ছোট্ট রাসেল
রাসেল আমার ভাই
ফুল-পাখি আর গান-কবিতায়
তাকেই খুঁজে পাই।

মুহাইমিন সরফরাজ, প্রথম শ্রেণি, অরণি বিদ্যালয়

নিবন্ধ

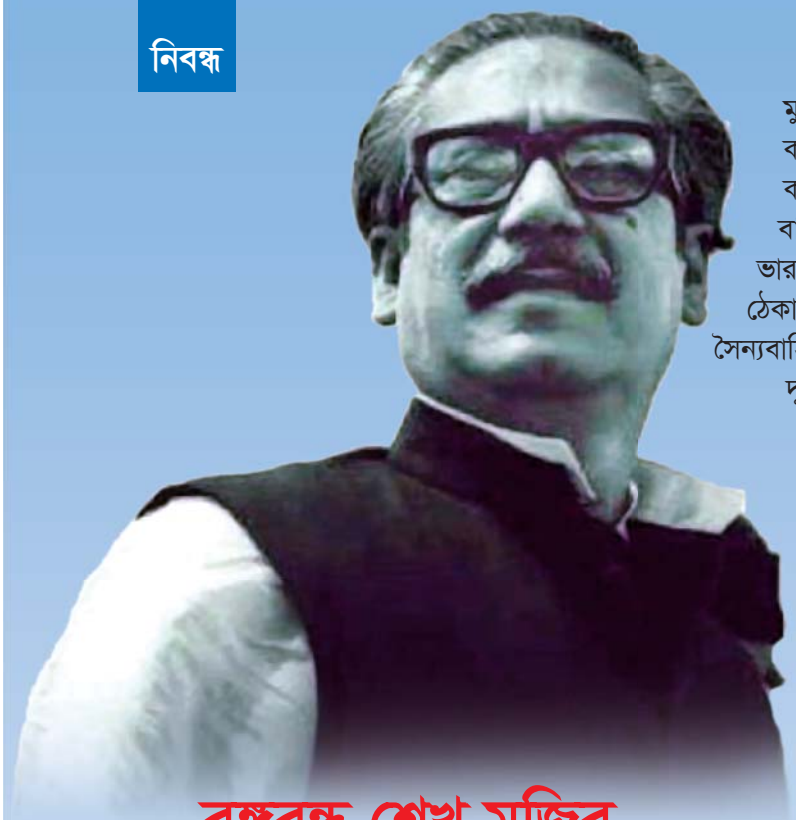

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব
দৃষ্টিসীমায় সেরা মানুষ

সিরু বাঙালি

উনিশশ ছেষট্টি সালের জানুয়ারির ২ তারিখ, জীবনে প্রথমবারের মতো চট্টগ্রাম ছেড়ে ঢাকায় পাড়ি দিয়েছিলাম আমি। ঢাকার লালবাগ কেল্লার পশ্চিমে নবাবগঞ্জ বাজার সংলগ্ন পানির ট্যাংকের কাছে ডাক্তার আফতাবুল আমিন নামে আমার এক বড়ো ভাই বাস করতেন। আমি এসেছি তার কাছে লেখাপড়ার উদ্দেশ্যে।

আমি ঢাকায় এসেছি এমন এক সময়, পূর্ব বাংলার অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অবস্থা যখন একেবারে নাজুক। মাত্র সাড়ে ৩ মাস আগে ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বরের প্রথম সপ্তাহে ভারত-পাকিস্তান রক্তক্ষয়ী যুদ্ধে দেশ একেবারে বিধ্বস্ত। '৬৫ সালের যুদ্ধের আমরা প্রত্যক্ষদর্শী। যারা '৬৫ সালের যুদ্ধ দেখেননি, তাদেরকে সে যুদ্ধের ভয়াবহতা বলে বোঝানো মুশকিল। শুধু এইটুকুন বলা যায়, কোনো কারণে যদি ভারত পূর্ব বাংলা আক্রমণ করত, তাহলে ৪/৫ ঘণ্টার মধ্যে পুরো পূর্ব বাংলা ভারতের দখলে চলে যেত। শক্তিশালী ভারতীয় পদাতিক, গোলন্দাজ ও বিমানবাহিনীকে ঠেকানোর মতো পর্যাপ্ত অস্ত্র-গোলাবারুদ ও সৈন্যবাহিনী পূর্ব বাংলায় ছিল না। দেড় হাজার মাইল দূরে বসে পাকিস্তানিদের আমাদের জন্য হাপিত্যেশ করা আর আঙুল চোষা ছাড়া করার কিছুই ছিল না।

১৯৬৫ সালে মাত্র ১৭ দিন যুদ্ধ হয়েছে ভারত-পাকিস্তানের মধ্যে। এই ১৭ দিন আমরা পূর্ব বাংলার মানুষেরা ছিলাম পৃথিবীর সবচেয়ে অরক্ষিত ও অসহায় মানুষ। কী স্থল, কী আকাশ, কী সমুদ্র কোনো পথেই দুনিয়ার কোথাও আমাদের যাবার ব্যবস্থা ছিল না। এক রেডিও ছাড়া, খোদ পাকিস্তানে কী হচ্ছিল সেটাও আমরা জানতে পারছিলাম না। বাঙালি জাতির এই অসহায় অবস্থা সবচেয়ে বেশি উপলব্ধি করেছিল বাংলা সংবাদপত্রগুলো। যুদ্ধের পর পরই দৈনিক ইত্তেফাক, দৈনিক সংবাদ ও দৈনিক আজাদ পত্রিকা চুলচেরা বিশ্লেষণ আর আগুন ঝরা ভাষায় পাকিস্তানের শোষণ-শাসন ও নির্যাতন বিষয়ে জনগণকে উদ্বুদ্ধ করতে লাগল। মানুষ বুঝতে শুরু করল দেড় হাজার মাইল দূরের দুটি পৃথক ভূখণ্ড কখনো এক রাষ্ট্রীয় কাঠামোয় থাকতে পারে না। আমাদের মাঝে পাকিস্তানি শোষকদের বিরুদ্ধে ধীরে ধীরে আগুনের শিখা প্রজ্বলন হতে শুরু করে।

আমার বড়ো ভাই ডাক্তার আফতাবুল আমিনের বাসা ছিল পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের ঢাকা সিটি সভাপতি হাফিজ মুহাম্মদ মুসা (নানা ভাই) সাহেবের বাড়ির পাশেই। নানা ভাইয়ের বৈঠকখানাটি নানান রকম পত্রপত্রিকায় ঠাসা থাকত সবসময়। পত্রিকা পড়ার লোভে নিত্যদিন সেখানে আমার যাওয়া অবধারিত ছিল। চট্টগ্রামে আমরা ঢাকার পত্রিকা পেতাম বিকেল ৩টার পরে। ঢাকায় ঘুম থেকে উঠেই পত্রিকা। এই সুযোগটা পত্রিকা পড়ায় আমার আগ্রহটা বাড়িয়ে দিয়েছিল।

ভেতরে ঢুকে, সালাম দিয়ে সংগ্রামী জননেতা শেখ মুজিবুর রহমান, আমাদের প্রিয় 'শেখ সাহেব'-এর সামনে দাঁড়ালাম। জীবনে এই প্রথম তাঁর সামনে আমার যাওয়া।

মাস খানেকের মধ্যেই হাফিজ মুসার সাথে আমার একটা হার্দিক সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল। তার প্রভাবে আমি নগর ছাত্রলীগের সদস্য হয়ে গেলাম। বয়সের বিরাট ব্যবধান সত্ত্বেও তিনি আমার সাথে বন্ধুর মতো আচরণ করতেন। তিনি যে আমাকে কতটা আপন ভাবতেন তার প্রমাণ পেলাম ১৯৬৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের ১০ তারিখ বৃহস্পতিবার রাতে। রাতেই তিনি আমাকে বলে রেখেছিলেন, ১১ তারিখ সকালে তিনি একটি বিশেষ জায়গায় যাবেন। আমি যেন তার সঙ্গী হই।

নবাবগঞ্জ পানির ট্যাংকের পূর্ব পাশে সুবল দাশ রোডের উপর দোতলা একটি মসজিদ আছে। নানা ভাই সেই মসজিদে ফজরের নামাজ শেষে আমাকে নিয়ে একটা রিকশায় করে ঢাকা নিউমার্কেটের দিকে রওয়ানা হলেন। আমাদের রিকশা গিয়ে থামল ধানমন্ডি ৩২ নম্বর সড়কে। রিকশা বিদায় করে আমরা গিয়ে দাঁড়ালাম দোতলা একটা বাড়ির সামনে। গেটে গিয়ে দাঁড়াতেই দেখলাম বাড়ির ভেতরের আঙিনায় একেবারে ঘরোয়া পোশাকে এদিক-ওদিক পায়চারি করছেন পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমান। তাঁর পরনে ছিল সাদা চেক লুঙ্গি। গায়ে হাফ হাতা সাদা গেঞ্জি। চোখে চশমা, হাতে চিরাচরিত সেই পাইপ। ফেব্রুয়ারির সহনীয় শীতের শিশির ভেজা ঘাসে খালি পায়ে হাঁটছেন তিনি।

আমাকে গেটের পাশে দাঁড়াতে বলে নানা ভাই ভেতরে গেলেন শেখ সাহেবের সাথে কথা বলতে। দুজনে অন্তরঙ্গ পরিবেশে কথা বলছিলেন। আমি অনেক দূরে থাকায় কিছুই শুনতে পারছিলাম না। শুধু এইটুকুন বুঝলাম, এটা পূর্ব নির্ধারিত সাক্ষাৎকার।

প্রায় ১২/১৩ মিনিট পর নানা ভাই আমাকে ডাকলেন। ভেতরে ঢুকে সালাম দিয়ে সংগ্রামী জননেতা শেখ মুজিবুর রহমান আমাদের প্রিয় 'শেখসাব'-এর সামনে দাঁড়ালাম।

জীবনে এই প্রথম তাঁর সামনে আমার যাওয়া। আমার ১৮ বছরের জীবনে এমন সুখকর ঘটনা আর ঘটেনি। পত্রপত্রিকায় তাঁর ছবি দেখেছি। বক্তৃতা পড়েছি। আজ একেবারে ১ হাত ব্যবধানে তাঁকে দেখলাম। ফটোর চাইতে বাস্তব শেখ মুজিব অনেক বেশি সুন্দর।

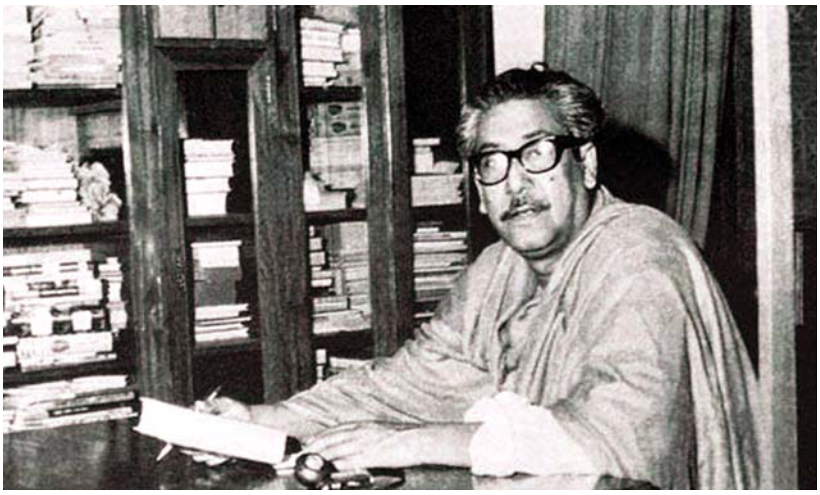

অনেক সুদর্শন। গড়পড়তা বাঙালির চাইতে একটু বেশি লম্বা, এই লোকটার সামনে দাঁড়িয়ে শ্রদ্ধায় আমার মাথা নুয়ে এল।

আমি কি সেদিন বুঝতে পেরেছিলাম, এই ক্ষণজন্মা মহাপুরুষটির জন্ম না হলে বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন দেশের জন্ম হবে না? না, ততটুকুন বোঝার বয়স এবং রাজনৈতিক

প্রজ্ঞা অর্জন, কোনোটাই আমার হয়ে ওঠেনি তখনো। তবে এইটুকুন বুঝেছিলাম, এই লোকের সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলার সৎ সাহস কস্মিনকালেও হবে না আমার।

নানা ভাই আমাকে শেখ সাহেবের সাথে পরিচয় করিয়ে দিলেন। বললেন, এর নাম ছেরু। চাটগাঁইয়া পুয়া। এটুকু বলে নিজে নিজে হাসলেন নানা ভাই। শেখ সাহেবও হাসলেন এবং আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, আজিজ মিয়া আর জহুর চৌধুরীকে চিনি কি না। আমি সত্যটাই বললাম। নাম শুনেছি তাদের। দেখাসাক্ষাৎ হয়নি কখনো।

শেখ সাব আমার পিঠ চাপড়ে দিয়ে হেসে বললেন, ঘাবড়েছ মনে হয়? ঘাবড়াবা না। তোমরাই আমার ভবিষ্যৎ। ঘাবড়ালে চলবে কেমনে।

বঙ্গবন্ধুর সাথে সেটাই আমার জীবনের সরাসরি শেষ সাক্ষাৎ। ওই সাক্ষাৎকারই আমার জীবনকে আলোকিত করে রেখেছে। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের নির্দেশনা মেনে নিজের জীবন বিপন্ন করে আমি যে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, সেটা তারই ধারাবাহিকতা।

মুজিব ভাই আমাকে না ঘাবড়াবার কথা কেন বললেন বুঝতে পারলাম না। আমার ফ্যাকাসে চেহারা দেখে তিনি কি আন্দাজ করতে পেরেছিলেন, সত্যি সত্যি আমি খুব ঘাবড়ে গিয়েছিলাম তাঁর সামনে? হতেও পারে।

যারা আমার প্রাণপ্রিয় মুজিব ভাইয়ের সামনাসামনি হবার সুযোগ আর কখনো পাবেন না, তাদের জানাই আমার বয়সি ছেলেমেয়ে যারাই জীবনে প্রথমবারের মতো মুজিব ভাইয়ের মুখোমুখি হয়েছে, প্রত্যেকেই ঘাবড়েছে! অনেকে এটা স্বীকার করেছে আমার কাছে। এর প্রধান কারণ তাঁর ব্যক্তিত্ব। একহারা, গড়পড়তা বাঙালির চাইতে অনেক লম্বা, সিংহের গর্জনের মতো কণ্ঠস্বর, না ঘাবড়িয়ে উপায় কী! আমরা তো বাচ্চা ছেলে। আমাদের কথা আর কী বলব? '৬৬-এর জুন-জুলাই মাসে মুজিব ভাইয়ের সাথে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে জেল খাটার সময় ডাকসাইটে অনেক জাঁদরেল নেতাকেও দেখেছি মুজিব ভাইয়ের সামনে কাঁচুমাচু হয়ে হাঁটু গেড়ে বসে থাকতে।

১৯৬৫ সালে ১৭ দিনের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের পর শেখ মুজিবুর রহমান 'বাঙালির মুক্তি সনদ ৬ দফা' নামে একটি ছোট্ট পুস্তিকা প্রণয়ন করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে সেটা ছিল বাঙালি জাতির স্বাধীনতার প্রথম ঘোষণাপত্র। ৬ দফা একদিন পূর্ব বাংলাকে পাকিস্তান থেকে পৃথক করে ফেলবে, প্রথম থেকেই এটা বুঝতে পেরেছিলেন পাকিস্তানি প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান। ফলে, যত রকমের কালাকানুন আর নির্যাতন আছে সব প্রয়োগ করা হলো মুজিবের উপর। তারই ধারাবাহিকতায় আওয়ামী লীগের বড়ো বড়ো নেতাসহ শেখ মুজিবকে সর্বশেষ ৮ই মে রাত ১টার সময় ধানমন্ডির বাড়ি থেকে পাকিস্তান দেশরক্ষা আইনের ৩২(ক) ধারায় গ্রেফতার করে ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে বন্দি করা হলো। ৩২(ক) ধারায় গ্রেফতারকৃতরা সাধারণত দেশের প্রচলিত আইনের সাহায্য পায় না।

বাঙালির গণমানুষের প্রাণপ্রিয় নেতা শেখ মুজিবের মুক্তি ও ৬ দফা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ১৯৬৬ সালের ৭ই জুন দেশব্যাপী একটি সর্বাত্মক হরতাল আহবান করে নেতৃত্ব শূন্য আওয়ামী লীগ। সেদিনই ঢাকার বাবুপুরা পুলিশ ফাঁড়ির সামনে ছাত্রলীগের একটি মিছিল থেকে আমাকে গ্রেফতার করে পাকিস্তানি ইপিআর ও পুলিশ বাহিনী। রমনা থানায় বেদম মেরে নাক ও মাথা ফাটিয়ে আমাকে যখন ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে পাঠানো হয়, তখন আমার সারা গায়ে ব্যান্ডেজ বাঁধা কিম্ভূতকিমাকার। প্রথমদিন থেকেই আমার জায়গা হয়েছিল ৩ নম্বর ওয়ার্ড, অর্থাৎ জেল হাসপাতালে। সেখানেই আমার সাথে প্রাণপ্রিয় মুজিব ভাইয়ের দ্বিতীয়বার সাক্ষাৎ হয়েছিল।

হাসপাতালে ভর্তির ৫দিন পর আমি জানতে পারলাম দোতলার ভিআইপি ওয়ার্ডে আমার রাজনৈতিক গুরু

হাফিজ মুহাম্মদ মুসা (নানা ভাই)ও ভর্তি আছেন। সঙ্গে সঙ্গেই গেলাম দোতলায়। দেখি নানা ভাইয়ের পাশে বসে আছেন বাংলার অবিসংবাদিত নেতা শেখ মুজিবুর রহমান। মুজিব ভাইয়ের সাথে কেন্দ্রীয় আওয়ামী লীগ নেতা কোরবান আলীও ছিলেন। আমি অত্যন্ত বিনীতভাবে ৩ নেতাকে সালাম দিলাম। নাকে-মুখে ব্যান্ডেজ করা নাতিকে ঠিকভাবে চিনতে পারেননি বর্ষীয়ান নেতা হাফিজ মুহাম্মদ মুসা। কিন্তু চটজলদি চিনে ফেললেন বাংলাদেশের স্বপ্নদ্রষ্টা আমার প্রিয় মুজিব ভাই। অবাক কণ্ঠে তিনি বললেন, আরে, চাটগাঁইয়া পুয়া ছেরু, তুইও? তোর এই অবস্থা কেন?

রমনা থানায় পুলিশি নির্যাতনের বর্ণনা শুনে মুজিব ভাই খুব দুঃখ পেয়েছেন বলে মনে হলো। পরে জেনেছি, আমার সু-চিকিৎসা ও উন্নত খাবারের জন্য তিনি ওয়ার্ড মেট ইদ্রিস আলীকে নির্দেশ দিয়েছিলেন। ঢাকা সেন্ট্রাল জেলে আমার ৬৯ দিনের জেলজীবনে পুরোটাই আমি যে ভিআইপি মর্যাদায় ছিলাম, সম্ভবত সেটি ভবিষ্যতের জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের গোপন নির্দেশের কারণেই।

বঙ্গবন্ধুর সাথে সেটাই আমার জীবনের সরাসরি শেষ সাক্ষাৎ। ওই সাক্ষাৎ আমার জীবনকে আলোকিত করে রেখেছে। বঙ্গবন্ধুর ৭ই মার্চের ঐতিহাসিক ভাষণের নির্দেশনা মেনে নিজের জীবন বিপন্ন করে আমি যে মুক্তিযুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিলাম, সেটা তারই ধারাবাহিকতা।

১৯৭৫ সালে বঙ্গবন্ধু শাহাদত বরণ করেছেন। ২১ বছর পাকিস্তানি তাবেদার একটি বাংলাভাষী সরকার বঙ্গবন্ধুকে পুরোপুরি অন্ধকারে অবদমিত করে রেখেছিলেন। শেখ মুজিবুর রহমান নামে একজন মানুষ কখনো বাংলাদেশে ছিলেন, বাঙালি জাতিকে তিনি পাকিস্তানি শোষণের কবল থেকে উদ্ধারে জান বাজি রেখেছিলেন, এই সত্য আমাদের ছেলেমেয়েরা যেন ভুলেই গিয়েছিল। কিন্তু ১৯৯৬ সালে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় আসার পর বিস্ময়ের সাথে সকলে লক্ষ করলেন, বিগত ২১ বছরে বঙ্গবন্ধুকে অন্ধকারে ঢেকে দেওয়ার শত চেষ্টা সত্ত্বেও, তাঁকে ঢেকে রাখা যায়নি। তিনি মানুষের অন্তরে স্বমহিমায় অধিষ্ঠিত ছিলেন, আছেন। বেকুব পাকিস্তানিরা বুঝতেই চায়নি কোনো দেশের স্বপ্নদ্রষ্টা জাতির পিতাকে মানুষের অন্তর থেকে মুছে ফেলা যায় না। পিতাকে ভুললে যে অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। ■

সাদাকাত আরহান চৌধুরী, শ্রেণি নার্সারি, সাউথ পয়েন্ট স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা

খোকার চশমা

রফিকুর রশীদ

খোকা এবার মাদারীপুরে ফিরে আসে নতুন চেহারায়, নতুন রূপে।

অসুখে ভুগে ভুগে শরীরের অবস্থা কাহিল। এমনিতেই তার লিকলিকে স্বাস্থ্য, মা সুযোগ পেলেই এটা ওটা হাতে তুলে খাওয়ায়, নানাভাবে সেবাযত্ন করে, খোকার হালকা পাতলা শরীরের কোনো পরিবর্তন হয় না। বাবার সরকারি চাকরি, নানান ব্যস্ততা। তবু ছেলের লেখাপড়ার কথা খুব ভাবেন। গিমাডাঙ্গা প্রাইমারিতে ক্লাস থ্রি পর্যন্ত পড়া হলে খোকাকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন। গোপালডাঙ্গা পাবলিক স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেন ক্লাস ফোর-এ। দিনের বেলা যেমনই কাটুক, রাত এলেই খোকার বুকভরা আনন্দ। বাবার গলা জড়িয়ে ধরে গল্প শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে যাওয়া। বংশের বড়ো ছেলে বলে বাবা তাকে বেশি বেশি আদর করেন। গল্প বলতে বলতে খোকার মনের ভেতরে স্বপ্ন ছড়িয়ে দেন। খেলাধুলায় উৎসাহ দেন। শরীর-স্বাস্থ্যের যত্ন নিতে বলেন।

কিন্তু খোকার শরীর সহসা বেঁকে বসে। অসুখ এসে বাসা বাঁধে তার লিকলিকে শরীরে। স্থানীয়ভাবে ডাক্তার কবিরাজের জোর চিকিৎসা চলে। বাবার চাকরি তখন মাদারীপুরে। খোকার সেবাযত্নের জন্যে গ্রাম থেকে মা ছুটে আসেন মাদারীপুরের বাসায়। খোকা তখন মাদারীপুর হাই স্কুলে ক্লাস সেভেনে পড়ে। সেই লেখাপড়া তার শিকেয় ওঠে অসুখের কারণে। মায়ের সেবা বাবার আদর কিছুতেই ভালো হয় না খোকার শরীর। ডাক্তারদের কাছে জানা গেল রোগের নাম বেরিবেরি। সাংঘাতিক রোগ। হার্ট দুর্বল করে দেয়। ধীরে ধীরে চোখেও আঘাত হানে। হ্যাঁ, শেষ পর্যন্ত চোখের অসুখই তার কাল হয়ে দাঁড়ায়। প্রায় বছর দুয়েক ধরে তো বেরিবেরি রোগের টানাহ্যাঁচড়া চলছেই, সেই সাথে যুক্ত হলো চোখের রোগ গ্লকোমা। রোগ বলে শুধু রোগ, ভয়াবহ সেই রোগ। সঠিক চিকিৎসা নিতে বিলম্ব হলে চোখ অন্ধ হয়ে যেতে পারে। বাবার বুক কেঁপে উঠে কোথায় মিলবে সঠিক চিকিৎসা। এই খোকা যে তার বংশের বাতি। চিকিৎসার জন্যে পিতা-পুত্র গিয়ে উঠলেন কলকাতা। সেখানে বড়ো বড়ো ডাক্তার আছেন। ভালো করে চোখ দেখবেন। চোখের চিকিৎসায় বিন্দুমাত্র অবহেলারও সুযোগ নেই, বিলম্বেরও অবকাশ নেই। পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর ডাক্তাররা জানান, অপারেশন করতে হবে, দুই চোখেই। বিলম্ব করা চলবে না। অপারেশনের কথা শুনে খোকার তো ভিমরি খাবার যোগাড়। গ্রামের ছেলে, যে-কোনো কাটা ছেঁড়াতেই তার আতঙ্ক। আর চোখের অপারেশনের কথায় বুক টান করে সাহস ধরবে কে। পালাবার পথ খোঁজে খোকা। কলকাতায় এসে বড়ো বোনের বাসায় উঠেছিল বাবার সঙ্গে, সেখানে থেকে ফাঁকফোঁকর গলিয়ে হয়ত কোনো রকমে কেটে পড়া যেত। কিন্তু কলকাতা মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল থেকে সে পালাবে কী করে?

না, কলকাতা মেডিকেলের কেবিন থেকে পালাতে পারেনি খোকা। ফন্দিফিকির মনে মনে করেছে ঠিকই, কিন্তু কাজে লাগেনি। ফলে ডাক্তারের ছুরির তলে আত্মসমর্পণ করতেই হয়েছে। দশ দিনের মধ্যে দুটো চোখেই অপারেশন করা হয়। এবং সে অপারেশন খুব সফলভাবেই সম্পন্ন হয়। খোকা তার দুই চোখে স্বচ্ছভাবে দেখতে পায়। তবু ডাক্তারের নির্দেশ, চশমা পরতে হবে। একটা নির্দিষ্ট পাওয়ারের চশমা সবসময় চোখে পরে থাকতে হবে। এ আদেশ শুনে খোকার খুব হাসি পায়। টুঙ্গিপাড়ার সেই তালপাতার সেপাই মার্কা ছেলেটি নাকের ডগায় চশমা পরে ঘুরে বেড়াবে। চশমা পরেই স্কুলে যেতে হবে। আহা, কতদিন স্কুলে যাওয়া হয় না। দিন মাস তো নয়, বছর পেরিয়ে গেছে। বছরের পর বছর। বন্ধুরা সবাই নিশ্চয়ই ক্লাসের পর ক্লাস ডিঙিয়ে চলে গেছে উঁচু ক্লাসে। কেউ তো তার জন্যে ক্লাস সেভেন-এর দরজা আগলে বসে নেই। অথচ তাকে ফিরে যেতে হবে সেই পুরনো স্কুলে পুরনো ক্লাসে। চশমা পরলেই হলো। এই যে প্রায় বছর দুয়েকের পিছিয়ে যাওয়া, কত কিছু পেছনে ফেলে যাওয়া, চশমা পরলেই এই সব ক্ষতি কি মুছে যাবে।

সারাদিন খোকার কোনো কাজ নেই। স্কুলের পড়ালেখা নেই। খেলার মাঠেও আগের মতো মন বসে না। ছেলেদের মধ্যে কেউ কেউ স্বদেশি আন্দোলনের মিটিং-এ যায়। তাদের সঙ্গে ভিড়ে খোকাও সেই দলে যাওয়া আসা শুরু করে। নেতাজী সুভাষ বোসের নাম শোনে। ইংরেজি তাড়ানোর কথা, দেশের স্বাধীনতার কথা শুনে খুব রোমাঞ্চিত হয়। 'মায়ের দেয়া মোটা কাপড় মাথায়' তুলে নে রে ভাই। স্বদেশি গান শুনে মনে শিহরণ জাগে। কখনো বা আপন মনে একা একাই গেয়ে ওঠে 'আয় দুনিয়ার মজদুর ভাইসব, সবে এক মিছিলে দাঁড়া।'

খোকা দেশের কথা ভাবে। সাধারণ মানুষের জীবনযাপনের দিকে তাকিয়ে বুঝতে পারে পরাধীনতা কাকে বলে। পরাধীনতার অভিশাপ থেকে মুক্তির পথ খোঁজে। চশমা চোখে পরার পর থেকে যেন সে নতুন দৃষ্টি পেয়েছে। সে দৃষ্টি তার বহুদূর পর্যন্ত বিস্তৃত। চওড়া কালো ফ্রেমের এই চশমা যেনবা তাঁকে স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখারও হাতছানি দেয়। এ রকম এলোমেলোভাবে আর কতদিন কাটবে একজন স্কুল পড়ুয়া ছাত্রের। অসুখবিসুখের অজুহাতে কতদিন কাটানো যায়। সরকারি চাকরিতে বাবার আবারও বদলি হয়েছে গোপালগঞ্জে। ছেলের সব কিছুতে নজরদারি করার সময় হয়ে ওঠে না। ছুটির দিনের

এক সকালবেলায় তিনি ছেলেকে ডেকে বলেন, এবার স্কুলে যেতে হয় যে খোকা।

খোকার মুখে কথা নেই। বাবা এগিয়ে আসেন। ছেলের কাঁধে হাত রাখেন, লেখাপড়া না জানলে ঠিকমতো দেশের সেবাও হয় না, বুঝেছ?

খোকা নীরব। বাবা যেন একটু বিরক্ত হন, কথা বলছ না কেন? স্কুলে যাবে না?

চোখ থেকে চশমা নামিয়ে আনে খোকা। বাবার মুখের দিকে তাকাতেই চোখ ছলছল করে ওঠে। কান্না ভেজা কণ্ঠে সে জানায়, আমি আর ওই স্কুলে যাব না। যাবে না। কেন?

পুরোনো বন্ধুরা সবাই উপরের ক্লাসে উঠে গেছে। আমাকে তো সেই ক্লাস সেভেনেই বসতে হবে।

এক নিমিষেই সংকটটা বুঝতে পারেন বাবা। ছেলেকে জড়িয়ে ধরে হো হো করে হেসে ওঠেন। হাসি থামলে বলেন, লজ্জা লাগবে তাই তো। শোনো বাপু, লজ্জা দ্বিধা ভয়, করতে হবে জয়। নতুন চশমা পরেছ, তোমার আবার লজ্জা কীসের। নতুন দৃষ্টিতে দেখতে হবে সব কিছু। খোকা তবু মুখ খোলে না। হাতের মুঠোয় ধরে রাখা চশমা চোখে পরবে নাকি হাতেই ধরে রাখবে তা নিয়েও দ্বিধা হয়। বাবার কথার ধারা যেন ধরতে পারে না ঠিকমতো। ফ্যালফ্যাল করে তাকায় বাবার মুখের দিকে। বাবা প্রস্তাব দেন, বেশ তো গোপালগঞ্জেই চলো। মিশন স্কুলে ভর্তি করিয়ে দেবো। নতুন স্কুলে সবকিছু নতুন করে শুরু করো।

চমৎকার এই প্রস্তাব শুনে খোকার মন ভালো হয়ে যায়। এমন একটা সমাধানই সে চেয়েছিল মনে মনে। খুশির চোটে বাবার গলা জড়িয়ে ধরে এবার সে জানতে চায়, নতুন স্কুলেও কি চশমা পরতে হবে। এই চশমা তোমাকে নতুন দৃষ্টি দিয়েছে। চশমা পরেই এখন থেকে সব কিছু স্বচ্ছ দৃষ্টিতে দেখতে হবে। ■

ছাত্র মুজিবের মহত্ত্ব ও নেতৃত্ব

অনুপম হায়াৎ

কবি গোলাম মোস্তফা লিখেছেন:

‘ভবিষ্যতের লক্ষ আশা
মোদের মাঝে সন্তরে,
ঘুমিয়ে আছে শিশুর পিতা
সব শিশুরই অন্তরে।’

কে জানত গোপালগঞ্জের টুঙ্গিপাড়া গ্রামের পিতা-মাতার সেই আদুরে শিশুই একদিন হয়ে উঠবেন জাতির পিতা, মহান নেতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান। বাবা-মা তাঁকে আদর করে ডাকতেন ‘খোকা’, খেলার সাথি, পড়ার সাথিরা ডাকত ‘মিয়া ভাই’। বড়ো হলে রাজনৈতিক কর্মীরা তাঁকে ডাকত ‘মুজিব ভাই’। ছাত্র-জনতা তাঁকে উপাধি দিলেন ‘বঙ্গবন্ধু’। আর বাংলাদেশের সংবিধান তাঁকে স্বীকৃতি দিয়েছে ‘জাতির পিতা’ ও ‘স্বাধীনতার স্থপতি’।

শৈশব-কৈশোরেই সেই খোকার মধ্যে ধরা পড়েছিল মানব সেবার মহত্ত্ব, খেলার সাথি, পড়ার সাথিদের সাথে বন্ধুত্ব ও নেতৃত্ব, চারিত্রিক সততা ও দৃঢ়তা এবং অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার গুণাবলি। তাঁর এসব গুণাবলির কথা জানা যায় নিজের লেখা ‘অসমাপ্ত আত্মজীবনী’, বন্ধুবান্ধবদের স্মৃতিকথা, সাক্ষাৎকার এবং গবেষকদের লেখা থেকে।

বঙ্গবন্ধু শৈশব-কৈশোরে লেখাপড়া করেছেন টুঙ্গিপাড়া এম.ই. স্কুল, গোপালগঞ্জ পাবলিক স্কুল, মাদারীপুর হাই স্কুল এবং গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে। স্কুল জীবনে লেখাপড়ার বাইরে তিনি খেলাধুলা করতেন, গান গাইতেন এবং ব্রতচারী করতেন। তিনি খুব ভালো ফুটবল খেলতেন। স্কুলে তিনি ছিলেন ফুটবল দলের ক্যাপটেন।

১৯৩৭ সালে বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলে ভর্তি হন। থাকতেন শহরে তাঁদের বাড়িতে। ঐ বাড়িতে লজিং থাকতেন কাজী আবদুল হামিদ নামে একজন শিক্ষক। ঐ শিক্ষক ছিলেন উচ্চ শিক্ষিত ও সমাজ সচেতন। তাঁর নেতৃত্বে ‘মুসলিম সেবা সমিতি’ নামে একটি সংগঠন গড়ে ওঠে। ওই সমিতির সঙ্গে কিশোর মুজিব যুক্ত হয়ে মানব সেবার প্রথম শিক্ষা গ্রহণ

করেন। ঐ সমিতির মাধ্যমে বাড়ি বাড়ি মুষ্টি চাল সংগ্রহ করে তা বিক্রি করে গরিব ছাত্রদের নানাভাবে সাহায্য করা হতো। ওই শিক্ষকের মৃত্যু হলে কিশোর মুজিব সেই সমিতি পরিচালনার ভার নেন। তিনি এই সমিতির সম্পাদক হন। এভাবেই কিশোর খোকা কিশোর মুজিব হয়ে ওঠেন কিশোর বন্ধু এবং মানবতার মহান সেবক। বঙ্গবন্ধুর মহানুভবতার আরো পরিচয় পাওয়া যায়। তাঁর এক সহপাঠী ছিল খুব গরিব। স্কুলে যাওয়ার পথে তিনি লক্ষ করেন যে, সেই ছাত্র বন্ধুটির লুঙ্গি ছেঁড়া। তা দেখে বঙ্গবন্ধুর হৃদয় কেঁদে ওঠে। পরে তিনি নিজের একটি লুঙ্গি সেই গরিব সহপাঠীকে পরতে দেন।

১৯৩৮ সালে বঙ্গবন্ধু যখন গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলের ছাত্র তখন বাংলার প্রধানমন্ত্রী শেরে বাংলা এ কে ফজলুল হক ও শ্রমমন্ত্রী হোসেন শহীদ সোহরাওয়ার্দী গোপালগঞ্জ পরিদর্শনে যান। তাঁদের সংবর্ধনা দেওয়ার জন্য মুসলমান ও হিন্দু ছাত্রদের নিয়ে 'স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী' গঠন করা হয়। এই বাহিনী গঠনে নেতৃত্ব দেন মিশন স্কুলের ছাত্র শেখ মুজিব।

১৯৩৯ সালে বঙ্গবন্ধু গোপালগঞ্জে মুসলিম ডিফেন্স কমিটি গঠন করেন। বঙ্গবন্ধু হন এই কমিটির সেক্রেটারি। এভাবে বঙ্গবন্ধু আস্তে আস্তে রাজনীতির মধ্যে প্রবেশ করেন।

বঙ্গবন্ধু কিশোর কাল থেকেই ভালো খেলাধুলা করতেন। তিনি ভালো ফুটবলার ছিলেন। তিনি গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলের ক্যাপটেন ছিলেন। আর তাঁর পিতা ছিলেন গোপালগঞ্জ অফিসার্স ক্লাবের সেক্রেটারি। অফিসার্স ক্লাবের মধ্যে এবং গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলের মধ্যে ফুটবল খেলার প্রতিযোগিতা হতো। খেলায় মুজিবের দলই জয়ী হতো। তবে একবার একটি শিল্ডকাপের চূড়ান্ত খেলায় স্কুলের হেডমাস্টারের অনুরোধে বঙ্গবন্ধুর দল তাঁর পিতার দলের কাছে এক গোলে হেরে যায়। আসলে এই হার ছিল তাঁর পিতার দলের মর্যাদা রক্ষার কৌশল।

এভাবেই কিশোর মুজিবের মধ্যে যে মহত্ত্ব, মানব সেবা ও নেতৃত্বের স্ফুরণ ঘটে ভবিষ্যতে তা আরো বিকশিত হয়ে স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র বাংলাদেশ গঠনের সূর্য-শক্তি হয়ে দাঁড়ায়। ■

'এই স্বাধীনতা তখনি আমার কাছে প্রকৃত স্বাধীনতা হয়ে উঠবে, যেদিন বাংলার কৃষক-মজুর ও দুঃখী মানুষের সকল দুঃখের অবসান হবে।'

'যার মনের মধ্যে আছে সাম্প্রদায়িকতা সে হলো বন্য জীবের সমতুল্য।'

'আর সাম্প্রদায়িকতা যেন মাথা চাঁড়া দিয়ে উঠতে না পারে। ধর্ম নিরপেক্ষ রাষ্ট্র বাংলাদেশ।

মুসলমান তার ধর্মকর্ম করবে। হিন্দু তার ধর্মকর্ম করবে। বৌদ্ধ তার ধর্মকর্ম করবে। কেউ কাউকে বাধা দিতে পারবে না।'

— বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

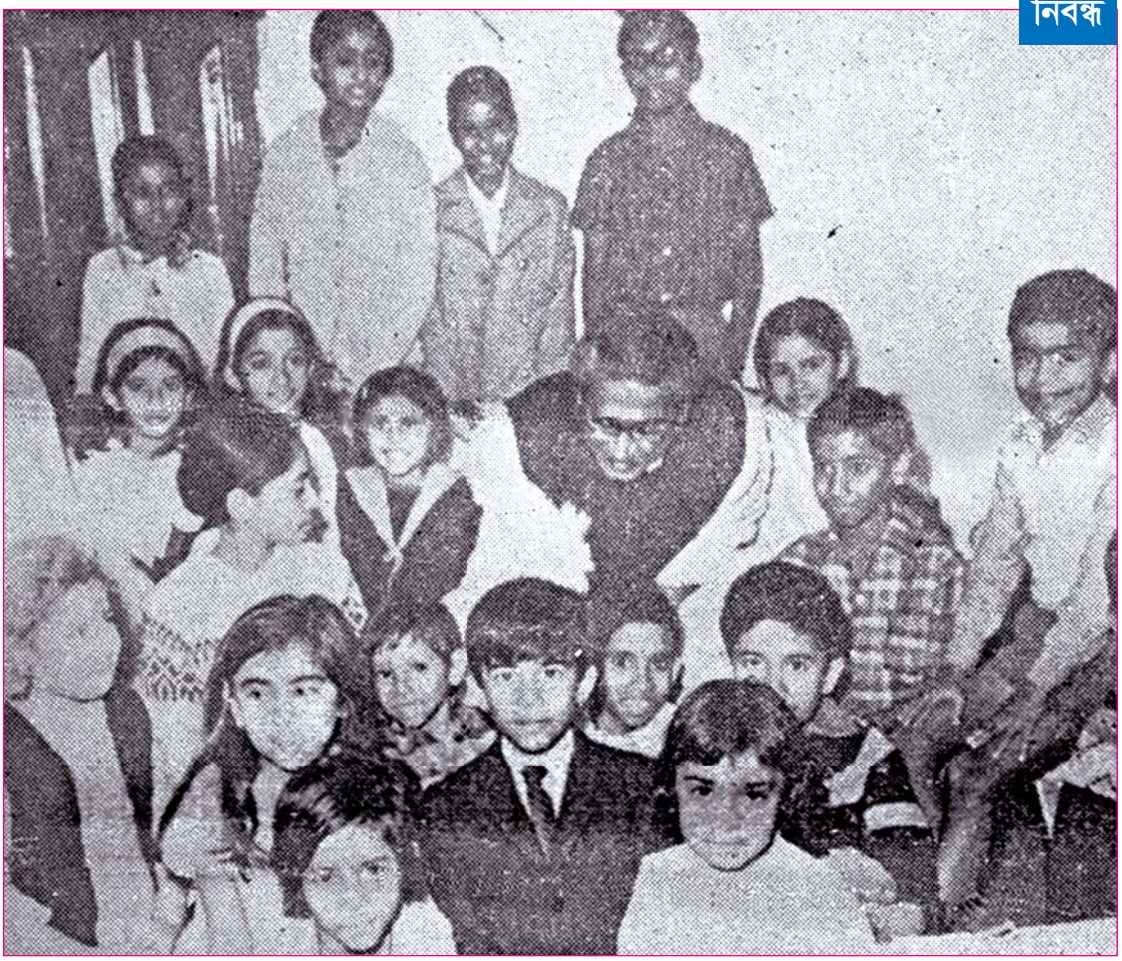

বঙ্গবন্ধুর বামে (ছবির সর্ব ডানে) হাফপ্যান্ট পরা দুই হাঁটুতে হাত রাখা হাস্যোজ্জ্বল বালকটিকে চিনতে পারছ? ছোটোবেলায় ছবি আঁকার জন্য শংকর পুরস্কার পেয়েছিলেন। বড়োবেলায় অসাধারণ ছড়া লিখে হয়েছেন আজকের লুৎফর রহমান রিটন! নবারুণের এই সংখ্যায় তাঁর লেখা কবিতাটি পড়েছ নিশ্চয়ই।

শিশুদের মাঝে বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গবন্ধুর শিশুস্নেহ

আখতারুল ইসলাম

বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর ১৯৭২ সালের মার্চ মাসের প্রথমদিকে বঙ্গবন্ধু যাচ্ছেন মস্কো সফরে। শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীন পরামর্শ দিলেন, বঙ্গবন্ধুর এমন কিছু উপহার সামগ্রী দেওয়া প্রয়োজন যা মস্কোর মানুষদের মনে একটা প্রভাব ফেলতে পারে। তা হলো শিশুদের আঁকা ছবির অ্যালবাম। বিষয়: মুক্তিযুদ্ধে গণহত্যা। তখন ৫ থেকে ১২ বছর বয়সের শিশুদের আঁকা ৩০টি ছবি নিয়ে ১৪ জন শিশু প্রধানমন্ত্রীর কক্ষে ঢুকতেই বঙ্গবন্ধু দাঁড়িয়ে হাসিমুখে তাদের অভ্যর্থনা জানিয়ে আদর করেন। বঙ্গবন্ধু এই শিশুদের আঁকা ছবি দেখে মুগ্ধ এবং অভিভূত হয়ে বললেন, আমার দেশের শিশুরা এমন ছবি আঁকতে পারে বিশ্বাস করা যায় না। তিনি আরো বলেন, মহিমান্বিত দিনে শিশুদের পেয়ে আমি শান্তি পেলাম।

বঙ্গবন্ধুর সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে তাঁর সর্বশেষ জন্মদিনে। ১৯৭৫ সালের ১৭ই মার্চ দিনটি। জন্মদিনের শুভেচ্ছা

জানানোর জন্য গণভবন প্রাঙ্গণে আন্তর্জাতিক বয় স্কাউট গার্লস গাইড আর কচি কাঁচার মেলায় খেলাধুলা করেন শিশু-কিশোররা। সারিবদ্ধ ছেলে-মেয়েরা ক্ষণিকের জন্য তাদের প্রিয় মানুষটিকে কাছে পেয়ে উল্লাসিত হয়ে উঠল। সেদিন দেখেছি বঙ্গবন্ধু আর শিশুদের মহামিলনের দৃশ্য।

শিশুস্নেহ

অতুলনীয় মানবিক গুণের অধিকারী ছিলেন বঙ্গবন্ধু। নিপীড়িত শিশুদের প্রতি তাঁর মমত্ববোধ ছিল অসাধারণ। 'বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব' গ্রন্থের লেখক বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ ড. মযহারুল ইসলাম এক জনসভায় উপস্থিত ছিলেন। জনসভা শুরু হবার আগে স্থানীয় নেতাদের সাথে মতবিনিময় করতে গিয়ে এক পর্যায়ে দেখা গেল শেখ সাহেব গম্ভীর হয়ে পড়লেন। ড. মযহারুল ইসলামের ভাষ্যমতে– 'আমি ঠিক তাঁর এই গম্ভীরতার কারণটি তখনো বুঝতে পারিনি। হঠাৎ গর্জে উঠলেন। আমি বিস্মিত হলাম। সামিয়ানার কাছাকাছি স্বেচ্ছাসেবকরা কিছু সংখ্যক ছোটো গ্রাম্য ছেলেকে জোরে জোরে ধাক্কা দিতে দিতে সরিয়ে নিয়ে যাচ্ছে এবং তাদের একজন মাটিতে মুখ থুবড়ে পড়ে গেছে। শেখ সাহেব আবার গর্জে উঠলেন এবং দ্রুতগতিতে সামিয়ানার এক প্রান্তে ছুটে গিয়ে ধমক দিয়ে সেই স্বেচ্ছাসেবকদের নিবৃত্ত করলেন।

তারপর যে ছেলেটি মাটিতে পড়ে গিয়েছিল তাকে তিনি বুকে জড়িয়ে ধরে বার বার আদর করতে লাগলেন। আর যে-সব ছেলে সেখানে স্বেচ্ছাসেবকদের ধাক্কায় আমজনতার বাইরে যাবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিল, তাদের সবার মাথায় হাত বুলিয়ে দিলেন এবং স্বেচ্ছাসেবকদের সবাইকে বুঝিয়ে দিলেন বাচ্চাদের সাথে এই ধরনের আচরণ যেন আর কখনো করা না হয়। এরপর তিনি জনতার সম্মুখের সামিয়ানার একেবারে কাছে শিশুদের নিয়ে এসে দাঁড় করিয়ে দিয়ে ভাষণ আরম্ভ করলেন। শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর সহজাত মমত্ববোধের প্রতীক হিসেবে বাংলাদেশ সরকার তাঁর জন্মদিনকে 'জাতীয় শিশু দিবস' ঘোষণা করেছেন। শিশুদের প্রতি বঙ্গবন্ধুর গভীর অনুরাগের স্বীকৃতি স্বরূপ এই দিবসটি প্রতিবছর বিশেষ গুরুত্বের সাথে পালিত হয়। ■

শিশুদের নিয়ে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের ছিল অবারিত দুয়ার। তাদের সঙ্গে সময় কাটানো, তাদের জন্য কিছু করার আগ্রহ ছিল তাঁর প্রবল। এমনকি তিনিই ভেবেছিলেন শিশুদের সুরক্ষায় পূর্ণাঙ্গ একটি আইন থাকা জরুরি। আর এই পথ ধরেই ১৯৭৪ সালের ২২শে জুন জাতীয় শিশু আইন (চিলড্রেন অ্যাক্ট) প্রণয়ন করা হয়।

জাতির পিতা

নিশি হোসেন

সারা পৃথিবী জুড়ে
রয়েছে যাঁর সুনাম
তিনি হলেন আমাদের জাতির পিতা
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান।

তাঁর নেতৃত্বে আমরা
স্বাধীনতা পেলাম
জানাই তাঁকে শোক দিবসে
হাজার শ্রদ্ধা ও সালাম।

বাংলা ও বাঙালি
থাকবে যতদিন
তাঁর অবদানের কথা
ভুলবে না কোনোদিন।

৮ম শ্রেণি, মোহাম্মদপুর প্রিপারেটরি স্কুল অ্যান্ড কলেজ, ঢাকা।

বঙ্গবন্ধুর ঈদ কেমন ছিল?

আজহার মাহমুদ

বঙ্গবন্ধু ছিলেন যেমন মহান, তেমনি দয়ালু। বাংলার মানুষের জন্য এবং এই সোনার বাংলার জন্য তাঁর ত্যাগ ছিল অবিস্মরণীয়। হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জীবন বাংলাদেশের আর দশজন সাধারণ মানুষের মতো ছিল না। তাই অন্য সবার মতো তিনি ঈদ উদ্‌যাপন করতে পারেননি। কারণ জীবনের অধিকাংশ সময় তিনি কারাগারে অতিবাহিত করেছেন। তাঁর জীবনের ৪ হাজার ৬৮২ দিন কেটেছে কারাগারে। ফলে বঙ্গবন্ধুর অনেক ঈদ কেটেছে জেলের ভেতর। পরিবার-পরিজন নিয়ে ঈদ করার সুযোগ তিনি কমই পেয়েছেন।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৯৬৭ সালে জেলে ঈদুলফিতর ও ঈদুল আজহা পালন করেন। 'কারাগারের রোজনামচা' গ্রন্থে তিনি লিখেছেন তাঁর সেই কারাগারের ঈদ নিয়ে। তিনি কারাগারে বসে বসে ভাবতেন, 'পূর্ব বাংলার লোক সেই দিনই ঈদের আনন্দ ভোগ করতে পারবে, যেদিন তারা দাসত্ব থেকে মুক্তি পাবে এবং দেশের সত্যিকার নাগরিক হতে পারবে।' কারণ তিনি ঠিকই জানতেন, পরাধীন জাতি কখনো ঈদের আনন্দ করতে পারে না। এই গ্রন্থে ঈদুল আজহার কথাও আছে। সেদিন ছিল ২২শে মার্চ, বুধবার। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, 'আজ কোরবানির ঈদ। গত ঈদেও জেলে ছিলাম। এবারও জেলে। বন্দি জীবনে ঈদ উদ্‌যাপন করা একটি মর্মান্তিক ঘটনা বলা চলে। বার বার আপনজন, বন্ধুবান্ধব, ছেলে-মেয়ে, পিতামাতার কথা মনে পড়ে। আমি তো একলা থাকি। আমার সাথে কোনো রাজনৈতিক বন্দিকে থাকতে দেয় না। একাকী কি ঈদ উদ্‌যাপন করা যায়?'

এমন বেদনার মধ্য দিয়ে বঙ্গবন্ধুকে ঈদ পালন করতে হয়েছে। ১৯৬৭ সালের দুবছর পর ১৯৬৯ সালে বঙ্গবন্ধু ঈদ পালন করতে তাঁর গ্রাম টুঙ্গিপাড়ায় গিয়েছিলেন। সেই সময় তাঁর মা সায়েরা খাতুন অসুস্থ ছিলেন। বাংলাদেশের প্রথম সারির একজন কবি ও লেখক নির্মলেন্দু গুণ লিখেছেন, '২৭ ফেব্রুয়ারি রাতে তিনি গ্রামের বাড়িতে অবস্থানরত তাঁর অসুস্থ মায়ের সঙ্গে ঈদ পালন করার জন্য স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের নিয়ে টুঙ্গিপাড়ায় যান। তেত্রিশ মাস একনাগাড়ে কারাবন্দি থাকার কারণে বিগত ছয়-ছয়টি ঈদ উৎসবের আনন্দ থেকে তিনি ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা বঞ্চিত থেকেছেন। অনেকদিন পর বঙ্গবন্ধুর পরিবারে ফিরে এসেছে ঈদের আনন্দ। ঐ পরিবারের ঈদের আনন্দ ছড়িয়ে পড়েছে দেশের মানুষের মনে। রাজনীতি ও মানুষের কল্যাণে কাজ করতে গিয়ে বঙ্গবন্ধুর বেশিরভাগ সময় কেটেছে

বঙ্গবন্ধুর অনেক ঈদ কেটেছে জেলের ভেতর। পরিবার-পরিজন নিয়ে ঈদ করার সুযোগ তিনি কমই পেয়েছেন।

জনতার সাথে। সেজন্য পরিবারকে তিনি ভালোভাবে সময় দিতে পারেননি। তাই যেবার তিনি পরিবার-পরিজন নিয়ে ঈদ করতেন সেবার তাঁর পরিবারে আনন্দের জোয়ার বয়ে যেত।

স্বাধীন বাংলাদেশে ঈদুল আজহা উদ্‌যাপন নিঃসন্দেহে ছিল ঐতিহাসিক ঘটনা। বাংলাদেশে তখন স্বাধীনতার পতাকা উড়ছে। বাঙালিরা ভেঙে ফেলেছে শত বছরের বন্দির শেকল। যেহেতু সদ্য মুক্তিযুদ্ধ শেষ হয়েছে, দেশ গড়ার কাজ চলছে পুরোদমে। তাই ১৯৭২ সালের ঈদ ভিন্ন মাত্রা নিয়ে সাধারণ মানুষের কাছে হাজির হয়েছিল। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান প্রধানমন্ত্রী হিসেবে যে বাণী দিয়েছিলেন তাতে লিখেছেন, ঈদুল আজহা আমাদের আত্মত্যাগের আদর্শ শিক্ষা দেয়। বাংলাদেশের সাহসী মানুষ দেশকে স্বাধীন করার জন্য সম্পদ ও রক্ত দিয়ে চরম আত্মত্যাগ স্বীকার করেছেন। তিনি চরম আত্মত্যাগের মনোভাব নিয়ে দেশের মানুষকে ঈদুল আজহা উদ্‌যাপন করার আহ্বান জানান।

১৯৭২ সালে স্বাধীন বাংলাদেশে বঙ্গবন্ধুর প্রথম ঈদ। সাধারণ মানুষ হিসেবে প্রতিবেশীদের সাথে ঈদ-আনন্দ ভাগ করে নিতেই বঙ্গবন্ধু ভালোবাসতেন। মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাও তাঁর পিতার মতো সাধারণভাবে ঈদ উদ্‌যাপন করতে পছন্দ করেন। জননেত্রীর ঈদের সময় কাটে তাঁর পরিবার-পরিজন ও বাংলার জনগণের সাথে। বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী হয়েও ঈদ আনন্দ ছড়িয়ে দেন বাংলাদেশের জনগণ ও দলীয় কর্মীদের মাঝে। পিতার আদর্শ গ্রহণ করে দেশ পরিচালনা করছেন তিনি।

কদিন আগেই আমরা ঈদুলফিতর পালন করলাম। সেই আনন্দকে সামনে রেখে জাতির শ্রেষ্ঠ সন্তান জাতির পিতা শেখ মুজিবুর রহমান-এর প্রতি আমরা গভীর শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতা জানাই। কারণ বঙ্গবন্ধু কেবল জনগণকে আত্মত্যাগ করতে বলেননি, তিনি নিজেও সারাজীবন আত্মত্যাগ করে গেছেন। সেই শৈশব থেকে আমৃত্যু সাধারণ মানুষের কল্যাণে নিজেকে বিলিয়ে দিয়ে গেছেন। তাই তো তিনি হাজার বছরের শ্রেষ্ঠ বাঙালি। তিনি স্বপ্ন দেখতেন ক্ষুধা, দারিদ্র্যমুক্ত ও অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের।

আসুন আমরা বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উদ্ভাসিত হই। পবিত্র ঈদে বঙ্গবন্ধুর স্বপ্ন সফল করার শপথ নেই এবং মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনাকে সোনার বাংলাদেশ গঠনে সহযোগিতা করি। ঈদ বাংলাদেশের জন্য কল্যাণ বয়ে আনুক, আপামর মানুষের মুখে হাসি ফোটাক এই কামনা করছি। ■

ঈদ

লাবিবা তাবাস্‌সুম রাইসা

ভাঙো সবে নিদ, এল খুশির ঈদ।
হচ্ছে অনেক মজা, এ দিন বছরের রাজা।
সারাদিন হবে কত হইচই
রাতে ভাববে সবাই, ঈদ গেল কই?
একে অপরকে উপহার করো অর্পণ,
পরস্পরের বাড়িতে করো পর্দাপণ।
থাকবে না ভেদাভেদ গরিব আর ধনীতে
পরিণত হবে সব আনন্দের খনিতে।

পঞ্চম শ্রেণি, বি.এ.এফ শাহীন কলেজ, ঢাকা।

গল্প

একটি জাদুঘরের স্বপ্ন

মনি হায়দার

এত ছোটো বাড়ি?

চোখ-মুখ কুঁচকে প্রশ্ন করে অভি। চোখের দৃষ্টি দাদার উপর থেকে আবার রাখে বাড়িটার উপর। অভির চোখে পাওয়ারের ভারী চশমা। পরনে হালকা আকাশি রঙের হাফ শার্ট আর হাফ প্যান্ট। গলার নিচে রক্ত রঙের টাই। পায়ে মোজাসহ সাদা জুতো। মাথা ভরা কালো চুল। মনে হচ্ছে দূরের দেশের একপুত্তুর অভি।

না, অভি দাদুর সঙ্গে এই বাড়ির সামনে একা আসেনি। সঙ্গে এসেছে চাচাতো ভাই সিন্দুক, চাচাতো বোন অমরাবতি। আরো আছে মামাতো বোন দোলনা। এই চারজনের সঙ্গে দাদা সাহেব- আবিদুর রহমান।

আবিদুর রহমানের বয়স আশি বছর পার হয়ে একাশিতে পরেছে। কিন্তু দাদা সাহেবের শরীর দেখে মনে হয় না, এত বয়স হয়েছে! ছিপছিপে গড়নের মানুষটির মধ্যে বাস করে ঘোড়দৌড়ের এক খেলার মাঠ। সেই মাঠে নাতি-নাতনিদের নিয়ে সারাদিন মশগুল থাকেন দাদা সাহেব।

বাৎসরিক পরীক্ষা শেষ। সবাই অবসর। হাই তুলে, গাল ফুলিয়ে , নাকে তেল দিয়ে সময় কাটে। দাদা সাহেব সবাইকে ডেকে বললেন, আগামীকাল বিকেলে তোমাদের এক জায়গায় নিয়ে যাব।

কোথায় নিয়ে যাবে? অমরাবতি এক মুহূর্ত কথা ছাড়া থাকতে পারে না।

আগে থেকে বলব না। আমার সঙ্গে গেলেই দেখতে পাবে। চলো–

ঠিক আছে। সিদ্ধান্ত জানায় চাচাতো ভাই সিন্দুক, ওরা কেউ যাক আর না যাক, আমি যাব।

কিন্তু আবার অমরাবতি মুখ খোলে, দাদা সাহেব যাবে কবে?

বললাম তো, আগামীকাল বিকেলের দিকে।

অপেক্ষায় থাকে সিন্দুক, অভি, অমরাবতি ও দোলনা। পরের দিন বিকেলের দিকে গাড়িতে ওঠেন আবিদুর রহমান। সঙ্গে অভি, দোলনা, সিন্দুক আর অমরাবতি। মিরপুরের গোল চক্কর পার হয়ে গাড়ি আসে রোকেয়া স্মরণীতে। রোকেয়া স্মরণী পার হয়ে গাড়ি ঢোকে শেরে বাংলা নগরে। শেরে বাংলা নগর পার হয়ে গাড়ি ঢোকে মিরপুরের রাস্তায়। প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনের পাশ ঘেঁষে আসাদগেট এবং শেখ কামাল রোড পার হয়ে গাড়ি এসে থামে ধানমন্ডির ৩২ নম্বর বাড়ির সামনে।

নামো সবাই, দাদা সাহেব বলেন।

ড্রাইভার নেমে গাড়ির দরজা খুলে দিলে চারজন ঝটপট নামে। নেমেই দেখে দাদা সাহেব আবিদুর রহমান সামনের বাড়িটার দিকে ব্যথা ভরা চোখে তাকিয়ে আছেন। তাকিয়ে তিনি ইতিহাসের অমলিন পাতা একের পর এক উলটাতে থাকেন। পিছনে দাঁড়িয়ে

চার নাতি-নাতনি।

দাদা ভাই? তুমি কী ভাবছ? জানতে চায় সিন্দুক।

ভাবছি না দেখছি–

দোলনা হাত ধরে, কী দেখছ?

দেখছি ইতিহাস।

ইতিহাস কি দেখা যায়? অবাক সিন্দুক। সিন্দুক নবম শ্রেণির ছাত্র। খুব মেধাবী।

হ্যাঁ দাদা ভাই, কিছু কিছু ইতিহাস দেখা যায়। আমার দেখা ইতিহাস তোমাদের দেখানোর জন্য নিয়ে এসেছি। চলো, ভেতরে চলো। এই যে বাড়িটা, ইতিহাস বাড়ি। বাড়িটা চেনো তো?

চিনব না কেন? চোখের ভারী পাওয়ারের চশমা ঠিক করতে করতে জবাব দেয় অভি, এটা শেখ মুজিবের বাড়ি।

হাসেন আবিদুর রহমান, ঠিক বলেছ।

বাড়ির দিকে পা বাড়ায় দাদা সাহেব। পেছন থেকে হাত ধরে অভি, শেখ মুজিব তো রাজা ছিলেন। সেই রাজার বাড়ি এত ছোটো কেন?

হাসেন আবিদুর রহমান, রাখাল রাজাদের বাড়ি ছোটো হয়। রাখাল রাজার বাড়ি যদি বিরাট হয়, বড়ো বড়ো লোহার গেট থাকে, সেই বাড়িতে কি রাখাল রাজার রাখাল বন্ধুরা ঢুকতে পারে? রাজার বাড়িতে যেন সবাই ঢুকতে পারে, সেই জন্য আমাদের রাজা ছোটো বাড়িতে থাকতেন। ভেতরে চলো, আরো ভালো করে দেখো।

সিন্দুক, অভি, দোলনা আর অমরাবতি ঢোকে রাজার বাড়িতে দাদা সাহেবের হাত ধরে। একটা নিটোল বাড়ি। বাড়ির মধ্যে সবুজ ঘাস। ছোটো-বড়ো গাছপালায় সারাটা বাড়ি ছায়ায় ঢাকা। দাদা সাহেব নাতিদের নিয়ে বাড়ির নিচের তলায় দরজার সামনে দাঁড়ায়। মুখ গম্ভীর।

দাদা ভাই, বিষণ্ন গলায় বলেন, এই যে দরজাটা দেখছ, এই যে জায়গাটা দেখছ– মনে হয় রক্ত মাখা, এই জায়গায় দাঁড়িয়ে রাখাল রাজার ছোটো পুত্র বলেছিল, আমি মায়ের কাছে যাব। কিন্তু... আবিদুর রহমানের গলায় কান্নার সুর। তিনি আর কথা বলতে পারছেন না। দাদা সাহেবের মতো সিন্দুক, অভি, দোলনা, অমরাবতির গলায় কান্না এসে আটকে যায়। চোখে নেমে আসে জল। রাখাল রাজার বাড়ি দেখতে আসা আরো অনেকে যোগ দেয় শোকের মিছিলে।

দাদা ভাই বলেন, চলো। রাজার বাড়িটা ঘুরে দেখবে।

চলো। দাদা ভাইয়ের হাত ধরে ওরা ঢোকে ইতিহাস গৃহে। সামনের ছোটো ঘরটা দেখিয়ে দাদা ভাই বলেন, এই রুমে নেতা পড়াশুনা করতেন।

তাই? কনফার্ম হতে চাইছে অমরাবতি।

মাথা নাড়েন দাদু ভাই, হ্যাঁ। নেতা প্রচুর পড়াশুনা করতেন। রবীন্দ্রনাথ-নজরুলের অনেক কবিতা তিনি আবৃত্তি করতেন। আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি... গানটাকে তিনিই তো আমাদের জাতীয় সংগীত করলেন।

অভি পকেট থেকে ডান হাতটা বের করে তাকায় দাদা ভাইয়ের দিকে, এই গানটা তো রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা।

দাদা ভাই গাল টেপেন অভির, এই জন্যই তোকে শিয়াল বলি।

শিয়াল মানে ?

অমরাবতি হাসে। কপাল কুচঁকে যায় অভির। সিন্দুক একটু নাচে। দোলনা মুখ ভেংচায়। আসলে ওরা অভির সঙ্গে বুদ্ধিতে, পড়াশুনায় পারে না। দাদা সাহেব শিয়াল বলায় ওরা একটু খুশি। মুখে আঙুল দিয়ে অভি গম্ভীর হয়ে তাকায় দাদা ভাইয়ের দিকে।

দাদা ভাই ঘাড় চুলকে বলেন, শুধু শিয়াল না, তুমি হলে শিয়ালপণ্ডিত। এই অসাধারণ ঘটনাটা ওরা কেউ জানে? জানে না। জানলে বলত। একমাত্র তুমিই জানো। তাই আদর করে তোমাকে শিয়ালপণ্ডিত বলেছি।

তাই বলো! অভির মুখে হাসি।

নিচের ঘরটা ঘুরে দেখে দোতলায় ওঠার সিঁড়ির কাছে দাঁড়ায়, এই সিঁড়ির শেষ ধাপে মহান নেতার পবিত্র শরীর পরেছিল। বেদনামাখা গলায় বলেন দাদা ভাই, ছবিতে নিশ্চয়ই দেখেছ কী পবিত্র হাসিমাখা সেই

মুখ। আমার মনে হয়, নেতার হাসিমাখা মুখে গোটা বাংলাদেশ স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল দোয়েলের শিষে, পদ্মার উজান স্রোতের মতো।

না, দাদা ভাইয়ের কথার পিঠে বলে দোলনা, তাঁর মুখে ছিল বাংলাদেশের পতাকার হাসি।

দারুণ বলেছিস তো! দাদা সাহেব দোলনার বাবড়ি দোলানো চুলে আদর করেন।

মোড়ানো সিঁড়ি বেয়ে দোতলায় উঠবার সময়ে সামনের দেয়ালের উপর পুরোনো ছোট্ট একটা সাইকেল দেখিয়ে দাদা ভাইকে প্রশ্ন করে অমরাবতি, নেতা কি এত ছোটো সাইকেল চালাতেন?

গাধা একটা? দাদা ভাইয়ের বলার আগে বলে অভি, এটা তো রাসেলের সাইকেল।

তুই কী করে বুঝলি এটা রাসেলের সাইকেল? গরম চোখে তাকায় দোলনা। অভির পাকামো একদম ভালো লাগে না দোলনার। দোলনা পড়ে ফাইভে। ফোরে পড়ে অভি। এক ক্লাস নিচের অভি সব জানে কী করে? মেজাজ গরম হয় দোলনার। তাকায় কড়া চোখে। গ্রাহ্য করে না অভি।

তোমরা তো পড়ালেখা করবে না। জানবে কী করে? রাসেলকে নিয়ে একটা বইয়ে আমি দেখেছি, রাসেল ঠিক এই রকম একটা সাইকেলে চড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। আমার মনে আছে এইটা সেই সাইকেল। দাদা ভাই, তুমি কী বলো?

গর্বে দাদা ভাই আবিদুর রহমানের বুক ভরে যায়। মনে মনে ভাবেন, আমার নাতিটা আমাকেও অতিক্রম করে যাবে।

দাদা ভাই বলো না। আমি ঠিকই বলেছি। আমার কাছে বই আছে। বাসায় চলো, আমি দেখাব।

তোর বই আমি ধরব না, গাল ফুলায় দোলনা।

নো ঝগড়া। দাদা ভাই নামেন রেফারির ভূমিকায়, আমরা এসেছি একটা পবিত্র ইতিহাস বাড়িতে। এখানে ঝগড়া করলে এই বাড়ির মহান মানুষেরা কষ্ট পাবেন। চলো, সিঁড়ি বেয়ে উপরে ওঠি।

উপরে দোতলায় উঠে নেতার শোবার ঘর, ডাইনিং টেবিল, খাবারের প্লেট, কাপ-পিরিচ, খাট, বইয়ের আলমারি, সোফাসেট দেখে। দেখে ঘাতকের ছোড়া বুলেটের দাগ দরজায়। সাধারণ একটা বাড়ি। ওরা-দোলনা, অমরাবতি, সিন্দুক আর অভি গল্পে জানে, রাজার বাড়ি মানে বিরাট বাড়ি। পাইক, পেয়াদা, বরকন্দাজ মিলে একটা মহা ঘটনা। বাড়ির সামনে থাকবে উন্মুক্ত তরবারি হাতে পাহারাদার। অথচ

দেখো- এখন থানার একটা ওসির বাড়ির সামনেও থাকে সাত-আটজন পাহারাদার।

সব ঘুরে দেখার পর দাদা ভাই একটা পড়ার টেবিলের সামনে দাঁড়ান। টেবিলটা দেখেন। প্যাশে ছোট্ট একটা চেয়ার। পুরোনো সময়ের কয়েকটি বই টেবিলের উপর সাজিয়ে রাখা। দাদা ভাই জিজ্ঞেস করেন সিন্দুককে, বলতে পারো এই পড়ার টেবিল আর চেয়ারটা কার?

সিন্দুক একা নয়, বাকি তিনজনও একসঙ্গে উত্তর দেয়, এটা রাসেলের চেয়ার-টেবিল।

দাদা ভাই আবিদুর রহমান হাসেন প্রাণখুলে, তোমরা এক একটা হীরের টুকরো। আর তোমাদের কাছে রাসেল খুব নিরাপদ থাকবে।

আমাদের কাছে রাসেল কীভাবে নিরাপদ থাকবে? অবাক অমরাবতি। ওকে তো মেরে ফেলেছে।

হ্যাঁ মেরেছে। কিন্তু ওর স্মৃতি আছে। সেই স্মৃতি তোমরা তোমাদের বুকের ভিতরে রেখে দেবে। বুকের ভেতরে রাখলে কেউ দেখতে পাবে না। সুতরাং কেউ কেড়েও নিতে পারবে না। একেবারে নিরাপদ–

দোলনা, সিন্দুক আর অমরাবতি হাসে। কিন্তু অভি গম্ভীর হয়ে পাশের রুমের সামনে দাঁড়ায়।

কী হলো পণ্ডিতের? দাদা ভাই মৃদু হাসেন। এগিয়ে যান অভির কাছে। অভি খুব মনোযোগ দিয়ে রুমের ভেতরটা দেখছে। রুমটার মধ্যে ছোটো একটা শার্ট আর একটা স্কুল ব্যাগ ঝুলছে।

দাদা ভাই ইশারায় তিনজনকে ডাকেন। ওরা এগিয়ে যায়। ভেতরে তাকায়। তাকিয়েই ওদের মুখটা কেমন বেদনাবিধুর হয়ে যায়।

এইটা রাসেলের জামা– হাত দিয়ে দেখিয়ে দেয় অমরাবতি।

সঙ্গে সঙ্গে দোলনা দেখায় স্কুল ব্যাগটা, ওইটা রাসেলের ব্যাগ।

পাশে ঝুলে থাকা বড়োদের প্যান্ট, শার্ট দেখিয়ে জানতে চায় দোলনা, দাদা ভাই ওগুলো কার?

কার আবার? দুই ভাই কামাল অথবা জামালের।

সবাই পিছনে তাকায়, অভি দুই পকেটে দুই হাত রেখে সামনের রুমের দিকে যাচ্ছে। ভাবখানা এমন যেন ও কাউকে চেনে না। একাই এসেছে ইতিহাস বাড়িতে।

ইতিহাস বাড়িটা দেখা শেষ। বিকেল। সূর্য নেমেছে পশ্চিমে। লম্বা ছায়া লুটিয়ে পরেছে রাস্তার উপর। আবার গেটে এসে দাঁড়ায় আবিদুর রহমান। সঙ্গে দোলনা, অমরাবতি, সিন্দুক আর অভি। গেট পার হয়ে সামনের রাস্তার উপর দাঁড়ায় সবাই। বাড়িটাকে অলৌকিক স্টিমার মনে হয়। জলে-স্থলে চলে, যায় বাড়ি বাড়ি। লিখে যায় রক্তের কাহিনি...।

কেমন লাগল তোমাদের? দাদা জানতে চান।

মাথা নাড়ায় সিন্দুক, খুব ভালো লেগেছে আমার। অনেক কিছু জানতে পারলাম।

এই ইতিহাস বাড়ির ঘটনা বইতে অনেক পড়েছি। কিন্তু আজ নিজের চোখে দেখলাম– বন্ধুদের বলব এই বাড়িতে আসতে– উত্তর দেয় অমরাবতি।

তোমার কেমন লাগল? দাদা ভাই জানতে চান দোলনার কাছে।

দোলনা হালকা দোল খাওয়ার মতো করে উত্তর দেয়, অসাধারণ লেগেছে আমার কাছে। এই ইতিহাস বাড়িতে আমাকে নিয়ে আসার জন্য আজ রাতে তোমার মাথার পাকা চুল বেছে দেবো।

সবাই হাসে কিন্তু অভি গম্ভীর। দুই হাত দুই পকেটে।

দাদা ভাই আবিদুর রহমান অবাক, তুমি কিছু বললে না যে!

দাদা ভাই, আমার মনে হয় রাসেলের নামে একটা জাদুঘর হওয়া উচিত। যে জাদুঘরে রাসেলের জামাকাপড়, বই, স্কুলের ব্যাগ, খাবারের প্লেট, পিরিচ, জুতো সব থাকবে। আমরা এসে সেই জাদুঘরে রাসেলকে খুঁজব। রাসেল আমাদের সঙ্গে গল্প করবে আমাদের সঙ্গে থাকবে।

মুক্তিযোদ্ধা আবিদুর রহমান দুই হাতে তুলে ধরেন অভিকে। সিন্দুক, অমরাবতি, দোলনা তাকিয়ে। ওরা দেখতে পাচ্ছে– আকাশের ওপার থেকে নেমে আসছে রাসেল নামের এক অলৌকিক রাজপুত্তুর, রাসেল জাদুঘরে সবাইকে স্বাগত জানাতে। ■

ডাকটিকিটে বঙ্গবন্ধু

বিনয় দত্ত

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের অস্থায়ী সরকার বা মুজিবনগর সরকার গঠিত হয় ১৯৭১ সালের ১০ই এপ্রিল। ১৭ই এপ্রিল মুক্তিযুদ্ধকালীন প্রবাসী বাংলাদেশ সরকার শপথ নেয়। দেশে তখন অবিরাম যুদ্ধ, যোগাযোগ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত। সে সময় মুজিবনগর সরকার একটি ডাকব্যবস্থা গড়ে তোলার গুরুত্ব উপলব্ধি করে এবং একটি কেন্দ্রীয় ডাকঘরসহ বেশ কিছু ফিল্ড পোস্ট অফিস স্থাপন করে। মুজিবনগর সরকার উপলব্ধি করে যে স্বাধীনতার স্বপক্ষে গোটা বিশ্ব জনমত সৃষ্টির জন্য ডাকটিকিট একটি শক্তিশালী ভূমিকা পালন করতে পারে। তাই তারা বাংলাদেশ নামে ডাকটিকিট প্রকাশের সিদ্ধান্ত নেয়।

বাংলাদেশ সরকার ব্রিটিশ পার্লামেন্টের সদস্য ও ডাক বিভাগের পোস্টমাস্টার জেনারেল জন স্টোনহাউসকে এ ডাকটিকিট প্রকাশের দায়িত্ব দেয়। জন স্টোনহাউস লন্ডন প্রবাসী বাঙালি নকশা প্রণয়নকারী বিমান মল্লিককে বাংলাদেশের ডাকটিকিটের নকশা করার দায়িত্ব দেন। বিমান মল্লিক তখন মুক্তিযুদ্ধের চলচ্চিত্রকে বিশ্লেষণ করে আটটি ডাকটিকিট ডিজাইন করেন। তারমধ্যে একটি ডাকটিকিট ডিজাইন করা হয় বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে।

১৯৭১ সালের ২৯শে জুলাই ডাকটিকিটগুলো একই সঙ্গে লন্ডন ছাড়াও কলকাতা, বাংলাদেশের মুক্তাঞ্চল, উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকা, ইসরাইল, অস্ট্রেলিয়া, জাপানসহ দূরপ্রাচ্যের বিভিন্ন অঞ্চল থেকে প্রকাশিত হয়।

সময়টা ১৯৬৮ সাল। তখন বাংলাদেশ নামক কোনো রাষ্ট্রের জন্ম হয়নি। সেই সময় আনোয়ারুল কাদির থাকতেন সৈয়দপুরে। পড়তেন অ্যাংলো পাকিস্তানি রেলওয়ে জুনিয়র হাই স্কুলে। শ্রেণি শিক্ষিকা নিয়মিত বাড়ির কাজের জন্য হাতের লেখা দিতেন। যে যত সুন্দর করে হাতের লেখা বাড়ি থেকে আনবে সে পুরস্কৃত হবে। দশে দশ নম্বর পেলেই শ্রেণি শিক্ষিকা পুরস্কার হিসেবে ইতালির ভিউ কার্ড বা ডাকটিকিট দিতেন। সেই প্রথম ইতালির ডাকটিকিট পেয়ে বিস্মিত হয়ে গিয়েছিল ছোট্ট আনোয়ারুল কাদির।

একটি ডাকটিকিট এত সুন্দর, আকর্ষণীয় হতে পারে তা তার ধারণায় ছিল না। ডাকটিকিটে দেশের নাম, মুদ্রার নাম, দেশের প্রধানের ছবি থাকে- এটা কাদিরকে সবচেয়ে বেশি বিস্মিত করে তোলে। তখন কাদির তার বাবার কাছে নিজ দেশের ডাকটিকিট দেখতে চায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেই সময় পরাধীন রাষ্ট্র হিসেবে নিজ দেশের কোনো ডাকটিকিট ছিল না।

কাদিরের বাবা শেখ তৈয়বুর রহমান ছিলেন তৎকালীন কায়েদে আজম কলেজ বর্তমান সৈয়দপুর কলেজের বাণিজ্য বিভাগের প্রধান। দেশের অস্থিতিশীল পরিস্থিতির খবরাখবর শুনে তিনি খুব দুঃখ প্রকাশ করতেন। কাদির তার বাবার কাছ থেকে দেশের সম্পর্কে জানতেন।

প্রথম বঙ্গবন্ধুর ডাকটিকিট সংগ্রহ

কাদিরের নানা আবদুল লতিফ সরদারের বাড়ি ছিল ঢাকাতে। ছুটিতে প্রায়ই কাদিররা নানা বাড়িতে বেড়াতে আসত। সেই সময় কাদির জানতে পারে ফার্মগেটে 'সালাম স্ট্যাম্প সেন্টার' নামের এক দোকানে বঙ্গবন্ধুর সেই ডাকটিকিট পাওয়া যাচ্ছে। এই কথা শোনার পর থেকে কাদিরের আর ঘুম নেই।

ঢাকায় আসার পর থেকেই কাদির তার বাবাকে অস্থির করে তোলে ফার্মগেট যাওয়ার জন্য। তখন দেশ মাত্র স্বাধীন হয়েছে। পরিস্থিতি তখনো স্বভাবিক হয়নি। ধীরে ধীরে সবকিছু স্বাভাবিক হতে যাচ্ছে। কিন্তু কাদিরের মন এইসব শুনতে নারাজ। বঙ্গবন্ধুর আদর্শের প্রতি তার প্রেম অগাধ।

অবশেষে নাছোড়বান্দা কাদিরকে নিয়ে তার বাবা ফার্মগেটের সেই 'সালাম স্ট্যাম্প সেন্টার'–এ যান। এই দোকানের মালিক আলহাজ এম এ সালাম। তিনি ছোটো কাদিরের অবস্থা দেখে তখনই ডাকটিকিটটি বের করে দেন। কাদির তা হাতে নিয়ে পরম মমতায় হাত বুলায়। কান্না পেয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়। কাদির নিজেকে শান্ত করে সেই ডাকটিকিট নিয়ে বাসায় চলে আসে।

বঙ্গবন্ধু দর্শন

বঙ্গবন্ধুকে কাদির খুব কাছ থেকে দেখেছে। আট নয় বছর বয়সের স্মৃতি কাদিরের কাছে স্পষ্ট না হলেও তার বাবার কাছ থেকে এই গল্প শুনেছে।

তারা খুলনা যাবে। তখন ঢাকা-খুলনা নৌপথে রকেট বা প্যাডেল জাহাজ চলত। সেই জাহাজে কাদিরের বাবা শেখ তৈয়বুর রহমানের নামে একটা রুম রিজার্ভেশন করা হয়েছে। সেই সময় রুম রিজার্ভেশন করলে রুমের উপরে নাম লেখা থাকত। রিজার্ভেশনের নির্দিষ্ট রুমে তারা দেখে শেখ মুজিবুর রহমানের নাম লেখা।

বিষয়টি কর্তৃপক্ষের কাছে জানালে তারা জানায়, বঙ্গবন্ধুকে বিশেষ কাজে পরিবার নিয়ে খুলনা যেতে হবে। তাহলে কাদিরদের কী হবে? বঙ্গবন্ধু বিষয়টি জানতে পেরে তৈয়বুর রহমানকে বললেন, 'যেহেতু আপনাদেরও খুলনা যেতে হবে আমাদেরও খুলনা যেতে হবে। আসেন রুম ভাগাভাগি করে নেই।' মুহূর্তেই সমাধান করে দেওয়ার ক্ষমতা শেখ তৈয়বুর রহমানকে বিস্মিত করে তোলে। এরপর দুই পরিবারই একসাথে খুলনা যায়। এই স্মৃতি কাদিরের স্মরণে না থাকলেও বাবার কাছ থেকে শুনে বেশ শিহরণ অনুভব করে।

কেন বঙ্গবন্ধু?

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এমনই এক নাম, যার গোটা জীবন রাজনৈতিক সংগ্রামের মধ্য দিয়ে কেটেছে। টুঙ্গিপাড়ায় এক সাধারণ পরিবারে জন্ম নেওয়া শেখ মুজিবুর রহমান স্কুল জীবনেই রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন। গোপালগঞ্জ মিশন স্কুলের অষ্টম শ্রেণির ছাত্র থাকা অবস্থায় তৎকালীন ব্রিটিশবিরোধী আন্দোলনে যোগদানের কারণে প্রথমবারের মতো কারাবরণ করেন বঙ্গবন্ধু।

বঙ্গবন্ধুর গোটা জীবনের ত্যাগ-তিতীক্ষা, রাজনৈতিক সংগ্রাম, কর্মজীবন, সাতই মার্চের ভাষণ, স্বাধীনতার ঘোষণা, কারাবরণ, দূরদর্শী নেতৃত্ব এবং বাংলাদেশ নামক একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের জন্ম দেওয়া এইসব ইতিহাস কাদির জানতে পেরে বঙ্গবন্ধুর প্রতি অনেক বেশি মাত্রায় অনুরক্ত হয়ে পড়ে। বঙ্গবন্ধুর প্রতি শ্রদ্ধাবশত কাদির সিদ্ধান্ত নিল বঙ্গবন্ধুর সকল ডাকটিকিট নিজের সংগ্রহে রাখবে। সেই থেকে শুরু হলো কাদিরের অভিযান।

১৯৭১ সালের ৭ই মার্চ। তখন কাদিরের বয়স এগারো। রেসকোর্স ময়দানের সেই ভাষণ শুনে কাদির মুক্তিযুদ্ধে যাওয়ার পরিকল্পনা করে ফেলে। কিন্তু পরিবার থেকে বাধা দেওয়ার কারণে কাদিরের মুক্তিযুদ্ধে যাওয়া হয়নি। দেশ স্বাধীন হওয়ার এত বছর পরও কাদির যখনই ৭ই মার্চের ভাষণ শুনেন তখনই আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন।

এইসব স্মৃতি হাতড়ে কাদির বঙ্গবন্ধুকে দূর থেকে একবার দেখার ঘটনা বলেন। সাল ১৯৭২, বাংলাদেশ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। তৎকালীন রেসকোর্স ময়দান বর্তমান সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে নৌকার মতো করে ইন্দিরা মঞ্চ করা হয়। বাংলাদেশের পরমবন্ধু এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধী বাংলাদেশে আসেন। কাদির তার বাবার সাথে ইন্দিরা মঞ্চে যায় বঙ্গবন্ধু এবং ইন্দিরা গান্ধীর ভাষণ শুনতে। সেই প্রথম বঙ্গবন্ধুকে দূর থেকে দেখার সৌভাগ্য হয়। পৌরুষদীপ্ত বজ্রকণ্ঠে মোহিত সবাই। মুগ্ধ দৃষ্টিতে কাদির দেখে বঙ্গবন্ধুকে। আর ভাবে, এই একজন মহানায়কের কারণে আজ বাংলাদেশ স্বাধীন। আজ বাঙালি স্বাধীনভাবে নিজের মাতৃভাষায় কথা বলতে পারছে। পাকিস্তানি শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করতে পারছে। এই বিষয়টি ভেবেই কাদির আবেগতাড়িত হয়ে পড়েন।

ডাকটিকিট সংগ্রহ

২৯শে জুলাই ১৯৭১ সালে বিমান মল্লিকের ডিজাইনে বঙ্গবন্ধুর প্রথম ডাকটিকিটটি কাদির সংগ্রহ করে একই বছরের ডিসেম্বরে। পরবর্তীতে দেশ স্বাধীন হওয়ার পর বিমান মল্লিকের ডিজাইনে ডাকটিকিটটি ওভারপ্রিন্ট করা হয়। ডাকটিকিটের উপর বাংলায় লেখা 'বাংলাদেশের মুক্তি' ইংরেজিতে লেখা 'Bangladesh Liberated' ডাকটিকিটটি প্রকাশিত হয় ২০শে ডিসেম্বর ১৯৭১ সালে। এই ডাকটিকিটটিও কাদিরের সংগ্রহে আছে।

১৯৭১ সালের পর ১৯৯৬ পর্যন্ত বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে আর কোনো ডাকটিকিট প্রকাশিত হয়নি। মতিউর রহমানের ডিজাইনে চার টাকা মূল্যমানের জাতীয় শোক দিবস স্মরণে একটি ডাকটিকিট প্রকাশিত হয় ১৫ই আগস্ট ১৯৯৬ সালে। এরপরে ধারাবাহিকভাবে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে বিভিন্ন ডাকটিকিট প্রকাশিত হতে থাকে। সর্বশেষ ২০১৮ সালের ২৯শে মে জাতিসংঘে বাংলাদেশ শান্তিরক্ষী বাহিনীর গৌরবময় ৩০ বছর বা বিশ্বশান্তি রক্ষায় বাংলাদেশের গৌরবদীপ্ত ৩০ বছর স্মরণে চল্লিশ টাকা মূল্যমানের ডাকটিকিটটি প্রকাশিত হয়, এর ডিজাইনার ছিলেন সঞ্জীব কান্তি দাস।

বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে ডাক বিভাগ থেকে প্রকাশিত সকল ডাকটিকিট কাদিরের সংগ্রহে আছে। শুধু ডাকটিকিট নয়, প্রতিটি ডাকটিকিট প্রকাশের দিন যে উদ্‌বোধনী খাম প্রকাশ করা হয় তাও কাদির যত্ন করে নিজের সংগ্রহে রেখেছে। এছাড়া ডাক বিভাগ থেকে প্রকাশিত আলাদা সুভেনির ও শিটলেট নিজের সংগ্রহে রেখেছে। এইখানে বলা ভালো, ডাক বিভাগ থেকে প্রকাশিত সুভেনিরগুলোর মধ্যে ডাকটিকিট এবং সুভেনিরের আলাদা মূল্য নির্ধারিত থাকে। আর অনেকগুলো ডাকটিকিট যখন একটি শিটে থাকে তাকে শিটলেট বলা হয়। কাদিরের কাছে বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে মোট ৩৫টি ডাকটিকিট, ৩৩টি উদ্‌বোধনী খাম এবং ১২টি সুভেনির আছে।

অতঃপর ডাকটিকিট

বর্তমানে কাদির সরকারি প্রতিষ্ঠানে কর্মরত আছেন। স্ত্রী নাসিমা বেগম ও দুই সন্তান এস. এম. নাফিস আনোয়ার ও এস. এম. মাহির আনোয়ারকে নিয়ে সুখেই দিনযাপন করছেন। ডাকটিকিট নিয়ে তার স্বপ্ন বহুদূর। ছোটো সন্তান মাহিরকে এখন থেকে বঙ্গবন্ধুর ত্যাগ,

সংগ্রাম, স্বাধীনতার ঘোষণা, কারাবরণের ইতিহাস জানায়। আর যখনই সময় পান বঙ্গবন্ধুকে নিয়ে সকল ডাকটিকিট, সুভেনির, শিটলেট ও উদ্‌বোধনী খাম মাহিরকে দেখায়। সে যেন মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ও বঙ্গবন্ধুর আদর্শে উজ্জীবিত হতে পারে এই কামনা কাদিরের সবসময়ের। তার মধ্যে পরবর্তীতে হাল ধরার রসদ দিয়ে কাদির নিজেও স্বস্তি পান। কাদিরের আশা মাহির একদিন এই সকল সংগ্রহ, ইতিহাস ধারণ করে নিয়ে যাবে তার পরবর্তী প্রজন্মের জন্য। ■

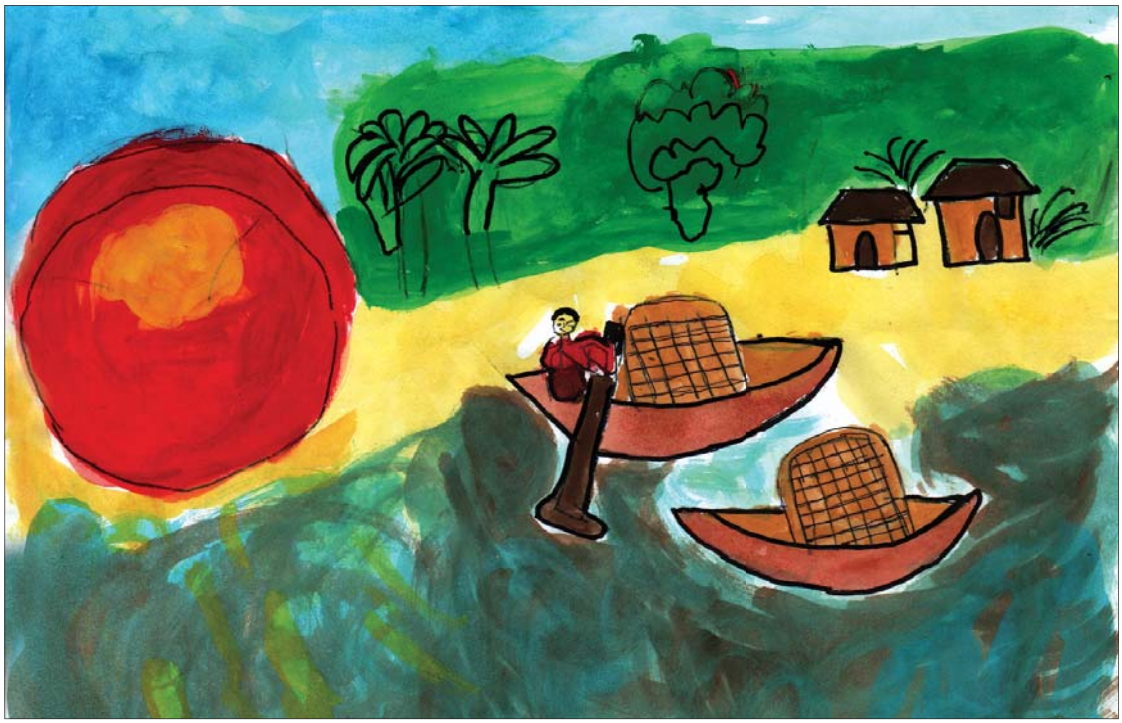

ফাতেমা জান্নাত অনিন্দিতা, চতুর্থ শ্রেণি, সিলভারডেল প্রিপারেটরি অ্যান্ড হাই স্কুল, ওয়ারি, ঢাকা

ঐতিহ্যবাহী ওয়ান্ডার্স ক্লাবের জার্সি পরা ফুটবলার শেখ মুজিবুর রহমান, ১৯৪৫

যে রেকর্ড শুধু বঙ্গবন্ধু পরিবারেরই

মেজবাউল হক

বঙ্গবন্ধু নিজে ছিলেন খ্যাতনামা ফুটবলার। দুই ছেলে কামাল ও জামাল এবং পুত্রবধূ সুলতানা কামালও ছিলেন ক্রীড়াঙ্গনের পরিচিত মুখ। পৃথিবীতে একই পরিবারে বাপ-ছেলের খেলোয়াড় হওয়া নতুন কোনো ঘটনা নয়। কিন্তু কোনো দেশের স্থপতি বা জাতির পিতার একই পরিবারে এতজন খেলাধুলার সঙ্গে জড়িয়ে থাকার রেকর্ড শুধু বঙ্গবন্ধু পরিবারেরই। সেই ব্যতিক্রম খবরটি জানাচ্ছি ছোট্ট বন্ধু তোমাদের—

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ফুটবলার ছিলেন তা সবারই জানা। বঙ্গবন্ধু খেলতেন স্ট্রাইকার পজিশনে। এ পজিশনে খেলে করেছেন অনেক অসাধারণ গোল। হ্যাটট্রিকও করেছেন বেশ কটি ম্যাচে। তৎকালীন বিখ্যাত ক্লাব ওয়ান্ডার্সের নিয়মিত ফুটবলার ছিলেন তিনি। এ ক্লাবের ১০ ও ৯ নম্বর জার্সি পরে খেলতেন বঙ্গবন্ধু। ১৯৪১ থেকে ১৯৪৮ সাল পর্যন্ত তিনি এই ঐতিহ্যবাহী দলের সাদা-কালো জার্সি পরেই মাঠ কাঁপিয়েছেন। পালন করেছেন অধিনায়কের দায়িত্বও। পেয়েছেন টুর্নামেন্ট সেরা ফুটবলারের পুরস্কার।

বঙ্গবন্ধুর অনুপ্রেরণা জোগায় দুই ছেলে শেখ কামাল ও শেখ জামালকে। শেখ কামাল ক্রিকেট, অ্যাথলেটিক্স ও বাস্কেটবল খেলায় অনেক পুরস্কার পেয়েছেন। বাবার মতো একই ক্লাব ওয়ান্ডার্সের বাস্কেটবল খেলোয়াড় ছিলেন শেখ কামাল। ১৯৭৩ ও ১৯৭৪ সালে ওয়ান্ডার্স লিগ জয়ের পেছনে শেখ কামালের অবদান স্মরণীয়

১৯৭৪ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আন্তঃহল চ্যাম্পিয়ন শেখ কামাল

হয়ে আছে। এছাড়াও মহসীন স্মৃতি ট্রফি জিতে শেখ কামালের নেতৃত্বে। সত্তর দশকে ক্রিকেটে অফ স্পিনার হিসেবে শেখ কামালের খ্যাতি ছড়িয়ে পড়ে ক্রীড়াঙ্গনে। খেলেছেন কলাবাগান ও আবাহনীতে। দেশের প্রতিষ্ঠিত ক্লাব ঢাকা আবাহনী ক্রীড়া চক্রের (বর্তমান আবাহনী লিমিটেড) প্রতিষ্ঠাতা শেখ কামালই। বঙ্গবন্ধু পরিবারের আরেক সন্তান শেখ জামালও খেলেছেন ফুটবল এবং অ্যাথলেটিক্স। ক্রীড়াঙ্গনে দুই ভাইয়ের ছিল অসম্ভব রকম আকর্ষণ। শেখ কামাল আবাহনী ক্রীড়া চক্র গড়ার পর শেখ জামাল ১৯৭৪ সালে ঐতিহ্যবাহী আজাদ স্পোর্টিং ক্লাব নামে ফুটবলের শক্তিশালী দল গড়েন। জামালের আহ্বানে সাড়া দিয়ে অসংখ্য তারকা ফুটবলার তখন যোগ দিয়েছিলেন আজাদে।

১৯৬৮ সালে পাকিস্তান গেমসে লং জাম্পে চ্যাম্পিয়ন সুলতানা কামাল

বঙ্গবন্ধুর পুত্রবধূ শেখ কামালের স্ত্রী সুলতানা কামাল খুকি ছিলেন দেশের খ্যাতনামা অ্যাথলেট। ১৯৬৭ সালে পাকিস্তান অলিম্পিক গেমসে লং জ্যাম্পে নতুন রেকর্ড গড়ে সোনা জিতে নেন। ১৯৭০ সালে অল পাকিস্তান অ্যাথলেটিকস–এ লং জ্যাম্পে চ্যাম্পিয়ন হন সুলতানা। তিনি ১৯৭৩ সালে প্রথম জাতীয় অ্যাথলেটিকস চ্যাম্পিয়নশিপে ১০০ মিটার হার্ডলসে সোনা জেতেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অ্যাথলেটিকসে প্রথম নারী ব্লু পাওয়ার কৃতিত্ব সুলতানারই।

বঙ্গবন্ধু কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাও একজন ক্রীড়া অনুরাগী। তাঁর সফল নেতৃত্বের ছোঁয়া পড়েছে দেশের ক্রীড়াঙ্গনে। সময় পেলেই ছুটে যান মাঠে খেলা দেখতে। অনুপ্রেরণা যোগান খেলোয়াড়দের। ■

বঙ্গবন্ধু দ্বীপ

রাজিউর রহমান

বঙ্গোপসাগরে মাছ ধরতে গিয়ে নতুন জেগে ওঠা একটি চরের দেখা পান মৎস্যজীবী মালেক ফরাজি। বঙ্গবন্ধুর ভক্ত ভালোবেসে জনমানবহীন এ দ্বীপের নাম দেন 'বঙ্গবন্ধু দ্বীপ'। যদিও স্থানীয়ভাবে এই দ্বীপটির নাম পুটনির দ্বীপ। ১৯৯২ সালে দুইজন জেলেসহ মৎস্য শিকারি মালেক ফরাজি যখন দ্বীপটিতে অবতরণ করেন, তখন এর আয়তন ছিল মাত্র দুই একর। বালি ও কাদায় পরিপূর্ণ ছিল দ্বীপটি । এরপর দীর্ঘদিন এর আয়তন না বাড়লেও ২০০৪ সালের পর থেকে দ্বীপটি ক্রমেই বড়ো হতে থাকে। ২০১৭ সালে এসে দ্বীপটির আয়তন দাঁড়িয়েছে ৭ দশমিক ৮৪ বর্গকিলোমিটারে।

গবেষকদের মতে, ১৯৭৬ সাল থেকেই স্যাটেলাইট ইমেজে দ্বীপটির অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। তখন দ্বীপটি মাঝে মধ্যে জেগে উঠত আবার ডুবে যেত। ২০০৪ সালের পর থেকে না ডুবে ক্রমেই বড়ো হচ্ছে দ্বীপটি।

সুন্দরবনের হিরণ পয়েন্ট থেকে ১৫ কিলোমিটার ও দুবলারচর থেকে ১০ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে দ্বীপটির অবস্থান। কোথাও চোরাবালি নেই। ভিজিবিলিটি অ্যানালাইসিস করে গবেষকরা নিশ্চিত হয়েছে, দ্বীপটির চারদিকের পানি অত্যন্ত স্বচ্ছ এবং পানির গুণগত মানও আদর্শ পর্যায়ে রয়েছে। আগামীতে দ্বীপটি আরো কিছুটা বড়ো হতে পারে।

'বঙ্গবন্ধু দ্বীপ' নিয়ে গবেষক দলের এক প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, বর্তমানে দ্বীপটির আয়তন ৭ দশমিক ৮৪ বর্গকিলোমিটার। এর উচ্চতা সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে প্রায় ২ মিটার। দ্বীপটির চারদিকে গড়ে উঠেছে প্রায় নয় কিলোমিটার দীর্ঘ ও ৫০০ মিটার প্রশস্ত সমুদ্রসৈকত। এর পেছনেই রয়েছে নয়নাভিরাম ছোটো ছোটো বালির ঢিবি বা বালিয়াড়ি। আর এক দশকেরও কম সময়ে গড়ে ওঠা সবুজ, শ্যামল বিস্তীর্ণ বনাঞ্চল ও ম্যানগ্রোভ ফরেস্ট। হরিণ , কচ্ছপ আর লাল কাঁকড়ার মনোরম ছোটাছুটি, স্বচ্ছ পানি, প্রশস্ত বালুকাভূমিসহ জীববৈচিত্র্যে দ্বীপটিকে আরো নান্দনিক করে তুলেছে। প্রাথমিকভাবে দ্বীপটিতে চার প্রজাতির কাঁকড়া, ১৬ প্রজাতির মোলাস্কা (শামুক-ঝিনুক ইত্যাদি), আট প্রজাতির প্লাংকটন ও দুই প্রজাতির বার্ণাকল পাওয়া গেছে। এছাড়া এক প্রজাতির এসিডিয়ানের সন্ধান মিলেছে, যা বাংলাদেশে প্রথম। স্থলজ প্রাণিকুলের মধ্যে ফড়িং, প্রজাপতি, মৌমাছিসহ বিভিন্ন প্রজাতির পোকা-মাকড়ের দেখা মেলে এখানে। মাইলের পর মাইল দীর্ঘ সৈকতে বসে উপভোগ করা যায় সূর্যোদয় ও সূর্যাস্ত । সাতাঁর কাটা যায় ভয়হীনভাবে।বন্ধুরা যাবে না কি ঘুরতে এই দ্বীপে। ■

স্মৃতিগাথা

স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী উদ্‌যাপন উপলক্ষে ধারাবাহিক

এক কিশোরী মুক্তিযোদ্ধা

লে. কর্নেল (অব.) কাজী সাজ্জাদ আলী জহির

উনিশ একাত্তর সালের মুক্তিযুদ্ধ ছিল একটি জনযুদ্ধ। এই যুদ্ধে পুরুষদের পাশাপাশি সরাসরি সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী নারী মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্যে মুক্তিযোদ্ধা করুণা বেগম অন্যতম। তিনি ১৯৫৩ সালের ২রা এপ্রিল বরিশাল জেলার মুলাদী থানার অন্তর্গত পাতারচর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। লেখাপড়া করেন পাতারচর প্রাথমিক বিদ্যালয় ও মুলাদী মাহমুদজান উচ্চ বিদ্যালয়ে।

১৯৬৭ সালে ইপিআর-এর প্রাক্তন সৈনিক ও কাজীরচর মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক শহীদুল হাসান চুন্নুর সঙ্গে করুণার বিয়ে হয়। ১৯৭১ সালের ৭ই মার্চের বঙ্গবন্ধু ভাষণ ও নির্দেশের পর থেকেই শহীদুল হাসান মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রস্তুতি গ্রহণ করে এলাকার তরুণদেরকে সংগঠিত করে প্রশিক্ষণ দিতে শুরু করেন। স্থানীয় মুক্তিযোদ্ধাদের অধিনায়ক হিসেবে তিনি মুলাদী এলাকায় বিভিন্ন অপারেশনে অংশ নেন। সেপ্টেম্বর মাসে যুদ্ধে আহত ও বন্দি শহীদুল হাসানসহ আরো দুজনকে জয়ন্তী নদীতীরে নির্যাতন করার পর গুলি করে নদীতে ভাসিয়ে দেয় পাকবাহিনীরা ।

এই ঘটনার পর পরই স্বামী হত্যার প্রতিশোধ নিতে করুণা গেরিলা হিসেবে প্রশিক্ষণ নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার সিদ্ধান্ত নেন। শ্বাশুড়ির কাছে তিন বছর বয়সি একমাত্র সন্তান মান্নাকে রেখে রাতের অন্ধকারে গৌরনদী থানার নলচিড়ার মুক্তিবাহিনী শিবিরে উপস্থিত হন। সেখানে মুক্তিবাহিনীর অধিনায়ক ছিলেন নিজাম উদ্দিন ও মো. কুতুব উদ্দিন আহমেদ।করুণা মুক্তিযুদ্ধে যোগদানের ইচ্ছার কথা

ব্যক্ত করলে প্রথমে তারা কিছুটা সিদ্ধান্তহীনতার মধ্যে ছিলেন। কিন্তু মুক্তিযুদ্ধে যোগদান করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ করুণা বেগম তাদেরকে জানান যে, তিনি পুরুষের মতো পোশাক পরিধান করবেন যেন তিনি যে নারী তা শিবিরের কেউ বুঝতেই না পারে। এতে প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও অপারেশনের সময় হয়ত কিছুটা সুবিধা হবে। পরদিন সন্ধ্যায় তিনি পুরুষের বেশে শিবিরে এলেন। গ্রেনেড, স্টেনগান ও রাইফেল চালানো ছাড়াও তিনি বিস্ফোরক দ্রব্য সম্পর্কে প্রশিক্ষণ নেন। মূলত তিনি গ্রেনেড নিক্ষেপে পারদর্শিতা অর্জন করেন। পরবর্তীতে বরিশালের বামরাইল, কাশিমাবাদ, বাটাজোড়, নন্দীবাজার, টরকীসহ বিভিন্ন এলাকায় গেরিলা যুদ্ধে অংশ নিয়ে সফলতার পরিচয় দেন। তাঁর দায়িত্ব ছিল ছদ্মবেশে শত্রু ছাউনির কাছে গিয়ে তাদের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করে মুক্তিযোদ্ধাদেরকে জানানো।

বেশ কয়েকটি সম্মুখ সমরে অংশ নিয়েছেন তিনি। কাশিমাবাদ যুদ্ধে একজন ভিখারিনির বেশে গ্রেনেড নিয়ে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর বাংকারের উপর গ্রেনেড নিক্ষেপ করেন। গ্রেনেডের শব্দে পাকবাহিনীরা নিরাপদ দূরত্বে যাওয়ার পর মুক্তিযোদ্ধারা পিছন থেকে হঠাৎ শত্রুর বাংকার আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে ১০জন পাকিস্তানি সৈন্য ও কয়েকজন রাজাকার হতাহত হয়। পরে করুণা বেগম বরিশাল মেডিক্যাল কলেজের সামনে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি চলন্ত ভ্যানের উপর গ্রেনেড নিক্ষেপ করে বেশ কয়েকজন পাকিস্তানি সৈন্যকে আহত করেন।

মুক্তিযোদ্ধা অধিনায়ক কুতুব উদ্দিনের নেতৃত্বে একটি দল ৬ই নভেম্বর বামরাইলে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর ক্যাম্প আক্রমণের প্রস্তুতি নেন। আক্রমণ শুরু করার পূর্বে অধিনায়ক তাঁর দলের মুক্তিযোদ্ধাদের মধ্য থেকে একজন স্বেচ্ছাসেবক চান যিনি প্রথমে গিয়ে শত্রুর বাংকার ধ্বংস করবেন। মুহূর্তেই করুণা ইচ্ছা প্রকাশ করলে কুতুব উদ্দিন করুণাকে দুটি গ্রেনেড দিয়ে শত্রুর বাংকার ধ্বংস করতে পাঠান। ক্রলিং করে শত্রুর অবস্থানের কাছে গিয়ে গ্রেনেড নিক্ষেপ করেন করুণা। তাঁর অব্যর্থ গ্রেনেড নিক্ষেপে শত্রুর বাংকারটি ধ্বংস হয় এবং মুক্তিযোদ্ধারা দ্রুত আক্রমণ করে সেই এলাকা থেকে পাকিস্তানি সৈন্যদের বিতাড়িত করতে সক্ষম হন।

গৌরনদীর কাছে পাকিস্তান সেনাবাহিনীর একটি স্টিলবডি লঞ্চের উপর আক্রমণ পরিকল্পনা করেন মুক্তিযোদ্ধা কুতুব উদ্দিন। পরিকল্পনা অনুযায়ী ১৫ই নভেম্বর স্টিলবডি লঞ্চটি যখন তীরে ভিড়ে তখন পাড়ে লুকানো করুণা বেগম লঞ্চের ভিতরে দুটি গ্রেনেড নিক্ষেপ করেন। সাথে সাথেই মুক্তিযোদ্ধারা স্টিলবডি লঞ্চের উপর ও আশপাশ থেকে গুলি বর্ষণ করতে থাকেন। ফলে যে-সকল পাকিস্তানি সৈন্য পানিতে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তারা নিহত হয়।

২১ শে নভেম্বরে সংঘটিত অপারেশন করুণা বেগমের শেষ যুদ্ধ। পাকিস্তান সেনাবাহিনী মাহিলারায় শক্ত ঘাঁটি স্থাপন করে সেখান থেকে তারা আশপাশের গ্রামগুলোর গ্রামবাসীদের উপর অত্যাচার চালাচ্ছিল। তাই মুক্তিযোদ্ধারা এ ঘাঁটি আক্রমণের প্রস্তুতি নিতে থাকেন। মুক্তিযোদ্ধাদের একটি দল পাকিস্তান সেনাবাহিনীর অবস্থানের দিকে এগিয়ে যান। করুণা বেগমের অবস্থান ছিল (মাহিলারা) পুল সংলগ্ন এলাকায়। প্রতিবারের মতো এবারও তাঁর হাতে ছিল স্টেনগান ও সঙ্গে দুটি গ্রেনেড। চারদিকে তখন প্রচণ্ড গোলাগুলি শুরু হয়ে গিয়েছে। অধিনায়কের নির্দেশ অনুযায়ী গ্রেনেড নিক্ষেপ করার জন্য এগিয়ে যান করুণা। হঠাৎ শত্রুর একটি গুলি এসে তাঁর ডান পায়ে লাগে। তখন সেখানে তাঁকে চিকিৎসা দেওয়ার মতো কোনো ব্যবস্থা ছিল না এবং আশপাশের কোনো হাসপাতালে নেওয়াও সম্ভব ছিল না। ক্ষতস্থান থেকে প্রচুর রক্তক্ষরণ হচ্ছিল বিধায় সহযোদ্ধারা গামছা দিয়ে তাঁর ক্ষতস্থান পেঁচিয়ে রাখেন এবং নদীর পানি দিয়ে তাঁর ক্ষতস্থান ধোয়ার চেষ্টা করেন। তারপর রক্তে ভেজা কাপড় নদীতে ফেলে দেওয়া হয় যেন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী বা রাজাকাররা কিছু বুঝতে না পারে। সহযোদ্ধারা সবাই সেদিন বুঝতে পারেন যে করুণা বেগম একজন নারী। মুক্তিযোদ্ধাদের সেদিনের আক্রমণ সফল হলো না।

এদিকে নিজেদের শিবিরে আসার পর করুণার শারীরিক অবস্থার অবনতি হতে থাকে। তাঁকে দ্রুত

হাসপাতালে না পাঠালে তিনি হয়ত আর বাঁচবেন না। মুক্তিযোদ্ধারা ছদ্মবেশে নানা কৌশলে তাঁকে গোপনে বরিশাল সদর হাসপাতালে নিয়ে যান। হাসপাতালের চিকিৎসকরাও সাবধানতার সঙ্গে তাঁর চিকিৎসা করার চেষ্টা করেন যেন তিনি শত্রুপক্ষের হাতে গ্রেফতার না হন।

১৯৭১ সালের ১৬ই ডিসেম্বর দেশ স্বাধীন হলো। কিন্তু আহত করুণা বেগমের তেমন কোনো উন্নতি না হওয়ায় ডিসেম্বরের শেষ দিকে মুক্তিযোদ্ধারা তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে আসেন। সেখান থেকে তাঁকে সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে প্রেরণ করা হয়। তবে তাঁর পা আর কখনোই পুরোপুরি ভালো হয়নি। সারাজীবনের জন্য তাঁকে পঙ্গুত্ব বরণ করতে হয়। সম্মিলিত সামরিক হাসপাতালে চিকিৎসাধীন থাকাকালীন ১৯৭২ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁকে দেখতে গিয়ে তাঁর সাহসিকতার প্রশংসা করেন। তাঁর সঙ্গে সেদিন ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রধান সেনাপতি কর্নেল এম এ জি ওসমানীসহ আরও অনেক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা। বঙ্গবন্ধু পরবর্তীকালে করুণা বেগমকে একটি পত্রও পাঠিয়েছিলেন। দেশ স্বাধীন করার সংগ্রাম শেষ হলেও করুণার জীবনসংগ্রাম শেষ হয়নি।

১৯৮৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে বরিশাল জেলার বাবুগঞ্জ থানার রাকুদিয়া গ্রামের মুক্তিযোদ্ধা গোলাম মোস্তফা মানিকের সঙ্গে করুণা বেগমের বিয়ে হয়। উল্লেখ্য, গোলাম মোস্তফা মানিক ও করুণা বেগম একসঙ্গে যুদ্ধ করেছিলেন। নানা সমস্যার কারণে ঢাকায় চলে আসেন তারা। মাথা গোঁজার মতো তাঁদের কোনো ঠাঁই ছিল না। খুব কষ্টে সংসার চলছিল। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা সম্মানী হিসেবে বসবাসের জন্য করুণা বেগমকে ১৪৪ নম্বর লালবাগে কিছু জমি বরাদ্দ দেন। এরপর থেকে তিনি পরিবারের সদস্যদেরকে নিয়ে সেখানে বসবাস করতে থাকেন। ইতোমধ্যে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা করুণা বেগম অসুস্থ হয়ে পড়লে ২০০৮ সালের আগস্ট মাসে প্রয়োজনীয় চিকিৎসার জন্য তাঁকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। পরে তাঁকে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয় হাসপাতালে স্থানান্তর করা হলে জানতে পারেন যে, তিনি দুরারোগ্য ক্যান্সার রোগে আক্রান্ত। ক্যান্সারের সাথে যুদ্ধ করে অবশেষে ২০০৯ সালের ২২শে জানুয়ারি শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন মুক্তিযোদ্ধা করুণা বেগম। ■

[লেখক : বীরপ্রতীক, স্বাধীনতা পদকপ্রাপ্ত]

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

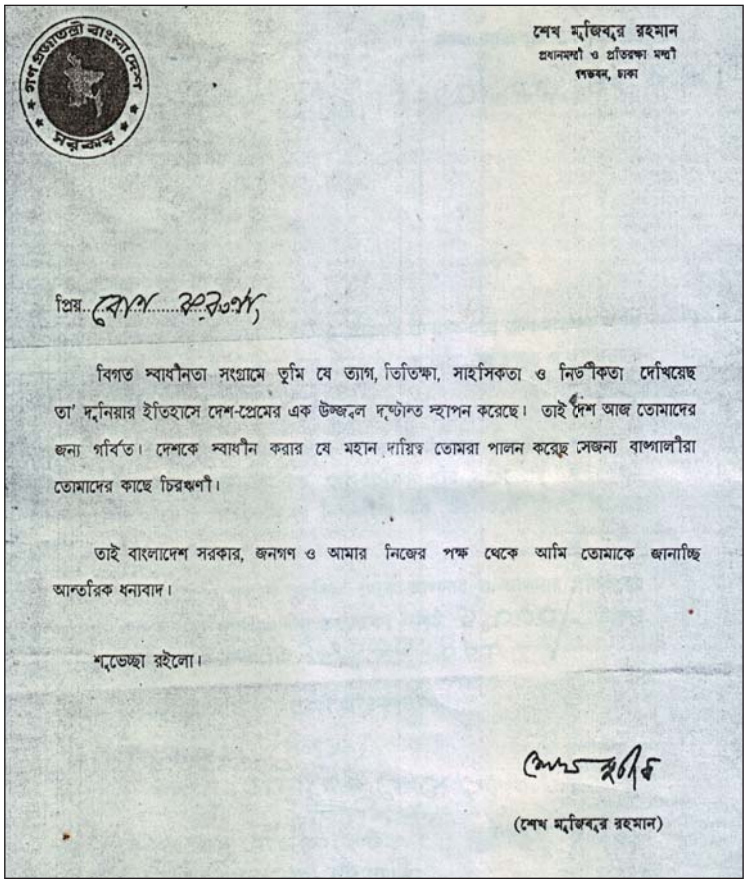

শেখ মুজিবুর রহমান
প্রধানমন্ত্রী ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রী
গণভবন, ঢাকা

প্রিয় বোন করুণা,

বিগত স্বাধীনতা সংগ্রামে তুমি যে ত্যাগ, তিতিক্ষা, সাহসিকতা ও নির্ভীকতা দেখিয়েছ তা' দুনিয়ার ইতিহাসে দেশ-প্রেমের এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। তাই দেশ আজ তোমাদের জন্য গর্বিত। দেশকে স্বাধীন করার যে মহান দায়িত্ব তোমরা পালন করেছ সেজন্য বাঙ্গালীরা তোমাদের কাছে চিরঋণী।

তাই বাংলাদেশ সরকার, জনগণ ও আমার নিজের পক্ষ থেকে আমি তোমাকে জানাচ্ছি আন্তরিক ধন্যবাদ।

শুভেচ্ছা রইলো।

শেখ মুজিব

(শেখ মুজিবুর রহমান)

মুক্তিযোদ্ধা করুণা বেগমকে লেখা বঙ্গবন্ধুর পত্র

মুক্তিযুদ্ধের কথা

শ্রেয়সী মুসাররাত

১৯৭১ সালের মার্চ মাস। তখন আমাদের দেশের নাম ছিল পূর্ব পাকিস্তান। পশ্চিম পাকিস্তান আমাদের দেশে হামলা করল। ওরা আমাদেরকে বলেছে যে, উর্দুতে কথা বলবে তোমরা। আমরা বললাম, 'না' আমরা বাংলা ভাষায় কথা বলব। এগুলো শুনে ওরা একদিন রাতে এসে আমাদের উপর হামলা করল। তখন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান বললেন— 'এবারের সংগ্রাম মুক্তির সংগ্রাম, এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম'। এভাবে নয় মাস যুদ্ধ হলো। আমাদের দেশ স্বাধীন হলো। ■

তৃতীয় শ্রেণি, এক্সেল একাডেমি স্কুল, ধানমন্ডি, ঢাকা

রাসেল আমার নাম

শেখ সালাহউদ্দীন

তোমরা কি ঠিক চিনেছ আমাকে? রাসেল আমার নাম
বত্রিশ নম্বর ধানমন্ডিতে একদা আমি ছিলাম
ছিলাম বলছি এই কারণে যে, এখন তো আমি নেই
অনেকে আমার নামই শোনেনি, ভুলে গেছ অনেকেই।
বত্রিশ মানে বত্রিশ নম্বর ধানমন্ডির বাড়ি—
যেখানে আমার ছিল সাইকেল, ঘুড়ি ও খেলনা-গাড়ি।
তোমরা কী জানো বত্রিশে রাখা আমার খেলনাগুলো
আছে ঠিকঠাক? নাকি তাতে আজ জমেছে অনেক ধুলো।
নাকি সেই রাতে দুষ্টু লোকেরা সবকিছু ভেঙেচুরে
নির্দয়ভাবে ফেলেই দিয়েছে ভাগাড়ে, আস্তাকুঁড়ে?
খেলনা আমার ছিল খুব কম, চাও না তোমরা মানতে?
কত বায়নায় একটা খেলনা পেতাম, যদি তা জানতে।
বাংলাদেশের অন্য দশটা ছোট্ট ছেলের মতন
সত্যি বলছি আমিও ছিলাম একেবারেই সাধারণ।
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর ছিলেন আমার পিতা
তাই তো কখনো শেখাননি তিনি অপচয় বিলাসিতা।
আমার তো ছিল কিছু কবুতর আহা কী যে পোষমানা।
হারিয়ে যেত না যদিও তাদের ছিল মজবুত ডানা
যখন তখন বসত আমার হাতের তালুতে কাঁধে
আমার জন্য ওরা কি এখন গোপনে গোপনে কাঁদে?
আচ্ছা বলো তো কোন অপরাধে আমাকে তোমরা মারলে?
কী করে এতটা নিষ্ঠুর হতে পারলে।
অনুরোধ করি শিশুর চোখের স্বপ্ন নিও না কেড়ে
ওরা ফেরেশতা জীবনের পথে ওদেরকে দিও ছেড়ে।
শিশুরা জ্বালায় পবিত্র আলো আলোহীন পৃথিবীতে
মানুষ কী করে পারে সে আলোর মশাল নিভিয়ে দিতে?
আমার একটি স্বপ্নের কথা বলে যাই অকপটে
ফের যেন আসি এই দেশে এই মায়াবী নদীর তটে।
যতবার খুশি মারো না আমাকে, দূরে ছুঁড়ে দাও ফেলে
যুগে যুগে তবু হতে চাই আমি শেখ মুজিবের ছেলে।

বোনের স্মৃতি

সরদার আবুল হাসান

রাতের বেলা চাঁদের আলো
উপচে পড়ে যেই
তখন দেখি আমার পাশে
রুম্পা মণি নেই।

পড়তে বসে সকাল-বিকেল
লাগত আমার পিছু
ভাঙলে গ্লাস ছিঁড়লে খাতা
বলত না তো কিছু।

পড়ল মনে বোনের কথা
এই তো সেদিন ঈদে
বলল ভাইয়া ফুচকা খাবো
লাগছে ভীষণ খিদে।

হারিয়ে গেছে বোনটি আমার
দূর আকাশের মাঝে
বোনের স্মৃতি হৃদয় পটে
ভাসে সকাল-সাঁঝে।

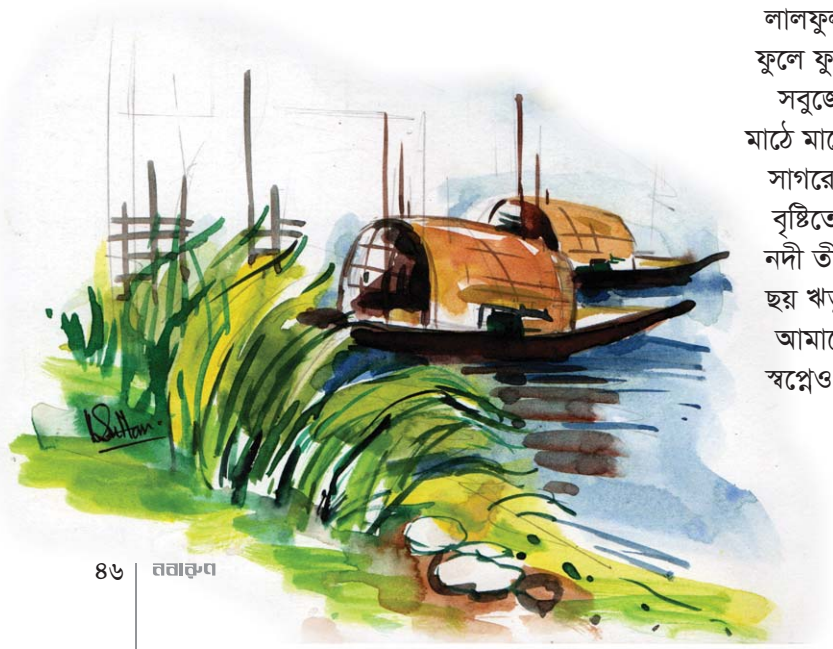

সাতরূপে সাত রং

বোরহান মাসুদ

ছয় ঋতু সাত রং, সারূপ্যে তার
দেশ জুড়ে ফুটে ওঠে রূপের বাহার
লালফুল, নীলফুল, গোলাপি, হলুদ
ফুলে ফুলে মৌমাছি হয়ে থাকে বুঁদ।
সবুজের ছড়াছড়ি গাছের পাতায়
মাঠে মাঠে সবুজেরা দোল খেয়ে যায়।
সাগরের জল নীল, নীল নীল মেঘ
বৃষ্টিতে মেঘ যেন ছড়ায় আবেগ।
নদী তীরে দুলে ওঠে সাদা কাশবন
ছয় ঋতু সাত রং কেড়ে নেয় মন।
আমাদের এই দেশ রঙের বাহার
স্বপ্নেও মিশে আছে সেই রং তার।

আন্তর্জাতিক পরমাণু বোমা বিরোধী দিবস ও হিরোশিমা দিবস ৬ই আগস্ট এবং ৯ই আগস্ট নাগাসাকি দিবস। পরমাণু বোমায় হিরোশিমা আর নাগাসাকি নামের জাপানের দুটি শহরে প্রাণ হারানো অসহায় মানুষদের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানাই। আমরা যুদ্ধ চাই না। কখনোই না।

যুদ্ধ

মো. ফেরদৌস সিদ্দিকী

পৃথিবীর প্রতি আনাচে কানাচে আরম্ভ হয়েছে যুদ্ধ
অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ আর আমরা অবরুদ্ধ।
নাই ভুল নাই শুদ্ধ
মানুষ আজ তার নিজের ভুলে নিজেই হয়েছে ক্ষুব্ধ।
রক্তের স্রোত ও আকাশে বাতাসে রক্তিম উচ্ছ্বাস
টিকে থাক বা মারা যাক তফাৎ এক নিশ্বাস।
হারালে প্রাণের ছন্দ
দূষিত মন ও দূষিত বাতাসে সব ভালো হয় মন্দ,
যুদ্ধ মানে রক্তের খেলা সংশয় প্রাণ নিয়ে
এমন সময় চলে গেলেও বারে বারে আসে ফিরে ।
যুদ্ধ হলো ভয়
বিশৃঙ্খল পরিবেশে ইহা ঘটায় মহাপ্রলয় ।
কত নাম না জানা যোদ্ধারা মারা গেল
মমতাময়ী সহস্র মাতা সন্তান হারাল ।
কত আদরের ধন
সেই প্রাণপ্রিয় সন্তানকেও দিলো সে বিসর্জন ।
রইল কী আর তার
যুদ্ধ তারে ফেলে চলে গেল রেখে শুধু হাহাকার ।
যুদ্ধ কী তবে সবার জন্য শুধুই অভিশাপ
প্রশ্নটি সময়ের দাবি সময়েই তোলা থাক ।
বৈরিতা সব ভুলে
মনের কথা একে অপরের কাছে বলি মন খুলে।
ভেঙে দাও সব মারণাস্ত্র সমাপ্ত হোক রণ
আর কেউ যেন অস্ত্র না ধরে এই পণ আমরণ ।
বিভীষিকাময় যুদ্ধে মোরা চাই না মোদের মরণ
মানব মনের বিবেকে যেন আর না হয় রক্তক্ষরণ ।

[যুদ্ধবিরোধী কবিতা]

নবম শ্রেণি, ঢাকা রেসিডেন্সিয়াল মডেল স্কুল, ঢাকা

সাদাকো সাসাকি

যুদ্ধযন্ত্রণার প্রতীক

শান্তিসারস হাতে সেই সাদাকো সাসাকি

জাহিদ রিপন

বন্ধুরা, তোমরা কি সাদাকো সাসাকির নাম জানো? সেই যে জাপানি ফুটফুটে বালিকা সাদাকো সাসাকি! তোমাদের মতোই সে বাবা-মায়ের আদর-স্নেহে বড়ো হচ্ছিল। কিন্তু মাঝে একটি অপ্রত্যাশিত ঘটনায় কোথা থেকে কী-যে হয়ে গেল! সে পরিণত হলো চিরকালের জন্য এক যুদ্ধযন্ত্রণার প্রতীক।

তোমরা নিশ্চয়ই দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে ১৯৪৫-এর ৬ই আগস্ট জাপানের হিরোশিমা শহরে যুক্তরাষ্ট্রের আণবিক বোমা নিক্ষেপের ঘটনাটি শুনেছ। এরপর তো ৯ই আগস্ট নাগাসাকি শহরে নিক্ষেপ করা হয়েছিল আরও একটি আণবিক বোমা। হিরোশিমা-নাগাসাকির সে আণবিক বোমার ঘটনায় যত মানুষ নিহত হয়েছে পৃথিবীর কোনো একক ঘটনায় এত মানুষ আর কখেনোই মারা যায়নি। ধারণা করা হয় যে, এ দুটি শহরে বোমায় তাৎক্ষণিকভাবে এবং পরে নানা ধরনের অসুখে ভুগে মোট মারা গেছে প্রায় ২লক্ষ ৪৭ হাজার মানুষ!

যা হোক, আমাদের এই সাদাকো সাসাকির বাড়ি ছিল হিরোশিমা। আর তার জন্ম ১৯৪৩-এর ৭ই জানুয়ারি। সে হিসাবে ১৯৪৫-এর ৬ই আগস্ট তার বয়স ছিল প্রায় আড়াই বছর। বোমা নিক্ষেপের কেন্দ্রস্থল অর্থাৎ এপিসেন্টার, হিরোশিমায় যাকে বলা হয়- গ্রাউন্ড জিরো, সেখান থেকে ২ কিলোমিটার দূরে ছিল সাদাকো সাসাকিদের বাড়ি। আর বিস্ফোরণের সময় অর্থাৎ স্থানীয় সময় সকাল ৮টা ১৫ মিনিটে সে বাড়িতেই ছিল। আর তখন সে সৌভাগ্যক্রমে বেঁচেও গিয়েছিল। কিন্তু আণবিক বোমার ক্ষতিকারক প্রভাব কি এতটাই সহজ! আসলে বিস্ফোরণের পর এলাকার বাতাসে ক্ষতিকারক তেজস্ক্রিয়তা বা রেডিয়েশন মিশে থাকে দীর্ঘদিন। তাই বিস্ফোরণের সময় ওখানে ছিল না কিন্তু কয়েকদিন পরে ওখানে গেছে এমন মানুষও আক্রান্ত হতে পারে ভয়াবহ তেজস্ক্রিয়তায়।

বিস্ফোরণের পরবর্তীকালে আপাত-স্বাভাবিকভাবেই বেড়ে উঠছিল সাদাকো সাসাকি। কিন্তু প্রায় ১০ বছর পরে অর্থাৎ ১৯৫৪-এর নভেম্বরে অসুস্থ হয়ে পড়ে সে। তখন তার বয়স প্রায় ১২ বছর। অসুস্থতা বাড়তে থাকলে ১৯৫৫-এর ফেব্রুয়ারিতে তাকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। নানা কষ্টকর পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর জানা যায় যে, সাদাকো সাসাকি তেজস্ক্রিয়তাজনিত লিউকোমিয়া বা ব্লাড ক্যান্সার-এ আক্রান্ত হয়েছে। হাসপাতালে অবর্ণণীয় যন্ত্রণার মাঝেও সে পড়তো জাপানি উপকথা আর নানা বই। দেখা করতে আসা বন্ধুদের কাছে শুনতো নানা গল্প। এভাবে পড়ে আর বন্ধুদের কাছে গল্প শুনে শুনে তার মনে এক বিচিত্র বিশ্বাস জন্মায়। তা হলো, সে যদি জাপানি 'অরিগমি' পদ্ধতিতে ভাঁজ করে এক হাজারটি কাগজের সারস বানাতে পারে তবেই সে এ-ই ভয়ংকর কষ্ট থেকে মুক্তি পাবে! কিশোরী সাদাকো সাসাকি তখন হাসপাতালের ঔষধের প্যাকেট, ফেলে দেওয়া কাগজ ইত্যাদি সংগ্রহ করতে থাকে। আর তা দিয়ে শুরু করে সারস বানানো।

সাদাকো সাসাকির স্মৃতিস্তম্ভের সামনে লেখক।

কিন্তু ক্রমশ তার অসুস্থতা বাড়তেই থাকে। শেষে বাবা-মা, আত্মীয়-স্বজন আর বন্ধুদের শোকের সাগরে ভাসিয়ে ৮ মাস পর ১৯৫৫-এর ২৫শে অক্টোবর এ নিষ্পাপ শিশুটি মারা যায়। আহা, তখন সে বানাতে পেরেছিল ৬৪৪টি সারস!

সাদাকো সাসাকির মৃত্যুর পর আণবিক অস্ত্রের প্রত্যক্ষ প্রভাবের পাশাপাশি পরোক্ষ ভয়াবহতা সমগ্র পৃথিবী যেন নতুন করে উপলব্ধি করতে পারল। শান্তিকামী মানুষেরা নতুন করে নড়ে-চরে বসলেন। কিন্তু সেটি তো বড়োদের বিষয়। ছোটোরা কী করল সেটা শোনো। ছোটোরা মানে সাদাকো সাসাকির বন্ধু, সহপাঠী আর সারা দেশের শিশুরা টিফিনের টাকা বাঁচিয়ে সেই টাকা দিয়ে হিরোশিমা পিস পার্ক-এ স্থাপন করলো একটি স্মৃতিস্তম্ভ। যে স্তম্ভের সুউচ্চে রয়েছে শান্তিসারস হাতে যুদ্ধযন্ত্রণার প্রতীক প্রিয় সাদাকো সাসাকি! আর নিচে লেখা রয়েছে বোধ-বিবেচনাহীন-স্বার্থপর বড়োদের প্রতি ছোটোদের আকুতি- এই আমাদের কান্না, এই আমাদের প্রার্থনা, পৃথিবীতে শান্তি আসুক- ('This is our cry, This is our prayer, Peace on earth')। পৃথিবী বাঁচাতে ছোটোদের এই আন্তরিক প্রয়াসের পরও কি বড়োরা সচেতন হবে না?

কিন্তু থামেনি মানবসভ্যতা ধ্বংসে বড়োদের এসব আয়োজন। হিরোশিমায় নিক্ষিপ্ত বোমা, যার নাম ছিল 'লিটল বয়', তার থেকে কয়েক হাজার গুণ শক্তিশালী বোমা এখন তৈরি করেছে তারা। তোমরা কি জানো যে, আজ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, রাশিয়া, যুক্তরাজ্য, ফ্রান্স, চীন, ইসরায়েল, পাকিস্তান, ভারত প্রভৃতি দেশের অস্ত্রভাণ্ডারে প্রায় পনেরো হাজার পারমাণবিক বোমা আছে! আর এসব বোমা দিয়ে সবুজ-কোমল-প্রিয় আমাদের এই গ্রহ পৃথিবীকে অন্তত আটাশ থেকে আটত্রিশবার পর্যন্ত ধ্বংস করা সম্ভব!

হিরোশিমায় সাদাকো সাসাকি-র স্মৃতিস্তম্ভে রয়েছে একটি ঘণ্টা, সেখানে যারাই যায় বিশ্বশান্তি প্রার্থনায় এ ঘণ্টাটি অন্তত একবার বাজায়। আর সারা পৃথিবী থেকে সাদাকো সাসাকিকে স্মরণ করে তৈরি নিয়ে যায় অসংখ্য কাগজের সারস। তাদের প্রত্যেকের মনে এ বোধটি কাজ করে যে, সাদাকি সাসাকো এক হাজার সারস বানাতে পারেনি কিন্তু আমাদের এ হাজার সারস বানানোর মধ্যদিয়ে যেন এ নিষ্পাপ শিশুটির আত্মা শান্তি পায় আর বর্তমান ও অনাগত শিশুরা যেন রক্ষা পায় যুদ্ধের ভয়াবহতা থেকে। বন্ধুরা, তোমরা যদি কখনও হিরোশিমা যাও তবে সাদাকো সাসাকির জন্য অবশ্যই সারস বানিয়ে নিয়ে যেয়ো। আর তার স্মৃতিস্তম্ভে ঘণ্টা বাজিয়ে বিশ্বশান্তির জন্য প্রার্থনা করতে ভুলো না। কিন্তু তোমরা যখন বড়ো হবে যুদ্ধের বিরুদ্ধে, আণবিক অস্ত্রের বিরুদ্ধে, জঙ্গিবাদের বিরুদ্ধে, সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যার যার জায়গা থেকে যথাসম্ভব ভূমিকা রেখো। ভুমিকা রাখতে অন্যদেরও বলো। তাহলেই হয়ত সাদাকো সাসাকিরা শান্তি পাবে। বিশ্বে আসবে শান্তি। ■

নকল নয়, আসল

ভাষান্তরঃ খায়রুল আলম সবুজ

বহুকাল আগে এক রাজকুমার বিয়ে করবে বলে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলল এবং রাজা ও রানিকে তার সিদ্ধান্ত জানিয়ে দিলো। তবে, রাজকুমার বাবা-মাকে সিদ্ধান্ত জানানোর সঙ্গে সঙ্গে তারা একটা শর্ত জুড়ে দিলো যে, রাজকুমারীকে অবশ্যই আসল হতে হবে। নকল রাজকুমারী হলে হবে না। রাজা-রানি তাকে আসল রাজকুমারী খুঁজে আনতে বললেন।

আসল রাজকুমারী পাবার আশায় রাজকুমার প্রায় সারাটা জগৎ ঘুরে বেড়ালো, কিন্তু মনের মতো কাউকেই খুঁজে পেল না। যত মেয়ে দেখেছে তাদের কাউকেই সঠিক সুন্দর বলা যায় না। কারো এটা ঠিক মনে হয় না, কারো আবার ওটা ঠিক লাগে না। শেষমেষ, কী আর করা, হতাশ হয়েই রাজপুত্র প্রাসাদে ফিরে এল।

একদিন সন্ধ্যায় প্রচণ্ড ঝড় শুরু হলো। বজ্র-গর্জনে কেঁপে উঠছে ধরিত্রী, বিদ্যুৎ চমকে ঝলসে উঠছে ঘর

বাড়ি, প্রাসাদ সব– তারই সঙ্গে মুষলধারে বৃষ্টি। বিকট শব্দে বিশ্বচরাচর ভেঙেচুরে কোথায় যেন চলে যাচ্ছে। ঠিক সেই সময় রাজপ্রাসাদের সিংহদরজার কড়া নড়ে উঠল তুমুলভাবে।

বৃদ্ধ রাজা নিজে উঠে গিয়ে দরজা খুললেন। খুলে দেখলেন দরজার বাইরে দাঁড়িয়ে আছে এক ফুটফুটে তরুণী। একেবারে কাহিল অবস্থা তার। ভিজে গেছে একেবারে। চুল বেয়ে পানি পড়ছে ফোঁটায় ফোঁটায়। চেহারায় কোনো জৌলুস নেই, কিন্তু সে দাবি করল সে প্রকৃত একজন রাজকুমারী।

শুনে রানি মাতা বললেন, 'আসল-নকল সে বোঝা যাবে।' এই বলে তিনি অতিথিদের জন্য সংরক্ষিত একটি ঘরে চলে গেলেন। বিছানার চাদর-বালিশ সব সরিয়ে ফেললেন। কয়েকটি শুকনো মটরশুঁটি রাখলেন খাটের উপর। তার উপর চাপালেন একের পর এক বিশখানা তোশক; সেই তোশকের উপর আবার বিছালেন বিশখানা পালকের বিছানা।

রাজকুমারীকে সারারাত এই বিছানায় কাটাতে হলো।

পরদিন সকালে রানি মাতা রাজকুমারীকে জিজ্ঞেস করলেন,'রাতে ঘুম কেমন হয়েছে গো মেয়ে।' রাজকুমারী বলল, খুব খারাপ। সারাটা রাত জেগে কাটল। দুই চোখের পাতা এক করতে পারিনি। পিঠের নিচে শক্ত শক্ত কী যেন বিঁধেছে। সারারাত এমন কষ্ট হয়েছে যে পিঠে কালশিরা পড়ে গেছে।

রানি মাতার আর কোনো সন্দেহ রইল না। বিশখানা তোশক ও বিশখানা পালকের বিছানার নিচে পড়ে থাকা তিনটি শুকনো মটরশুঁটির অস্তিত্ব যে এভাবে টের পায়, সে আর যাই হোক বা নাই হোক নকল হতে পারে না। উত্তর শুনে রানি মাতা সামান্য একটু হাসলেন আর তাতেই বোঝা গেল তাঁর সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। ■

আমার সবচেয়ে বড়ো শক্তি আমার দেশের মানুষকে ভালোবাসি, সবচেয়ে বড়ো দুর্বলতা আমি তাদেরকে খুব বেশি ভালোবাসি।

দেশ থেকে সর্বপ্রকার অন্যায়, অবিচার ও শোষণ উচ্ছেদ করার জন্য দরকার হলে আমি আমার জীবন উৎসর্গ করব।

সাত কোটি বাঙালির ভালোবাসার কাঙাল আমি। আমি সব হারাতে পারি, কিন্তু বাংলাদেশের মানুষের ভালোবাসা হারাতে পারব না।

– বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান

নিবন্ধ

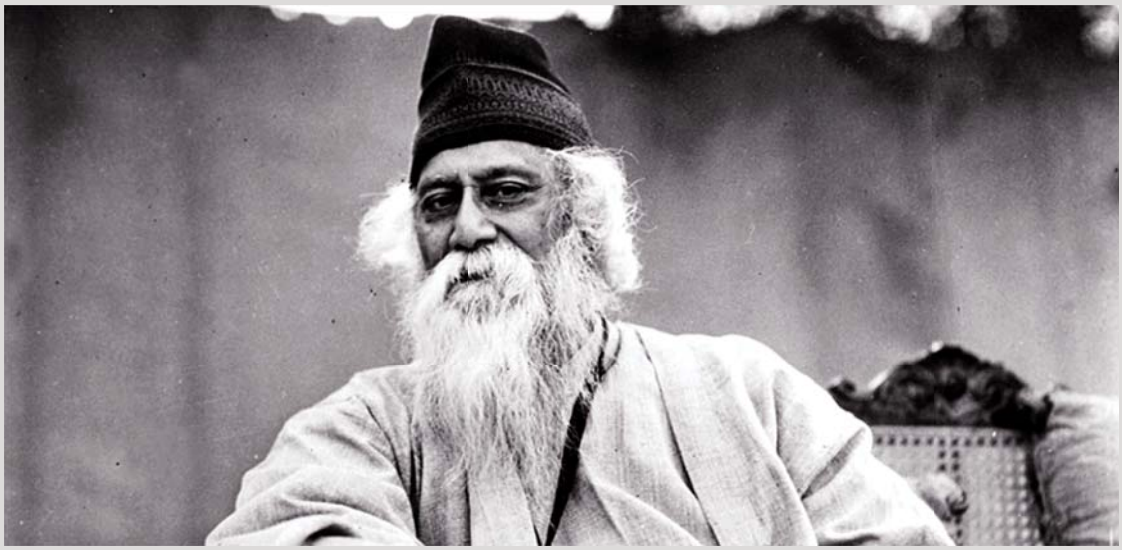

কবিগুরুর প্রথম ও শেষ!

তপন মুৎসুদ্দী

জোড়াসাঁকোর ঠাকুরবাড়ি। ৭ই আগস্ট ১৯৪১ সাল। চিরতরে চলে গেলেন বিশ্বকবি কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বাংলা সাহিত্যের প্রথম নোবেল পুরস্কার জিতে নেওয়া বাঙালির প্রাণের কবি চলে গিয়েও প্রমাণ করেছেন, তিনি ছাড়া বাঙালির একদিনও চলে না। দু'হাজারের বেশি গান। কবিতার সংখ্যা পাঁচ হাজারেরও বেশি। অংসখ্য কাব্যগ্রন্থ। এই বিপুল সাহিত্য সম্পদ আমাদের পরম প্রিয়। তাঁকে নিয়ে কথা বলতেও তাই ভালো লাগে খুব।

মৃত্যুর আগে লেখা তাঁর সর্বশেষ কবিতাটি পড়ে নেই আবার-

'তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি
বিচিত্র ছলনাজালে,
হে ছলনাময়ী!
মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে
সরল জীবনে।
এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্ত্বেরে করেছ চিহ্নিত;
তার তরে রাখ নি গোপন রাত্রি।'

মাত্র আট বছর বয়স থেকে কবিতা লিখতে শুরু করেছিলেন। তবে নিজের নামে লিখতেন না। ছদ্মনাম দিয়েছিলেন 'ভানুসিংহ'।

১৮৭৪ সালে 'তত্ত্ববোধিনী' পত্রিকায় প্রকাশিত হয় প্রথম কবিতা। তখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র তেরো বৎসর। কবিতার নাম ছিল 'অভিলাষ'। পড়ে দেখ, কিশোর কবির সেই কবিতাটি:

'জনমনোমুগ্ধকর উচ্চ অভিলাষ!
তোমার বন্ধুর পথ অনন্ত অপার ।
অতিক্রম করা যায় যত পান্থশালা,
তত যেন অগ্রসর হতে ইচ্ছা হয়।

.....

.....

সকলেই যদি নিজ নিজ অবস্থায়
সন্তুষ্ট থাকিত নিজ বিদ্যা বুদ্ধিতেই
তাহা হলে উন্নতি কি আপনার জ্যোতি
বিস্তার করিত এই ধরাতল-মাঝে?'

কিশোর কবি তখনই কী দারুণ কথা বলেছিলেন, তাই না? আহা কবিগুরু, আহা! ■

আমার দেখা কবি নজরুল

হারুন-উজ-জামান

ইউসুফ হায়দার আদিব, অষ্টম শ্রেণি, উইলস্ লিট্‌ল ফ্লাওয়ার স্কুল অ্যান্ড কলেজ

আমাদের জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম। ডাক নাম তাঁর দুখু মিয়া। নামের অর্থ পুরোপুরিভাবে প্রতিফলিত হয়েছে তাঁর জীবনে। দারিদ্র্য ঘোচাতে রুটির দোকানে কাজ, মক্তবে শিক্ষকতা, মাজারের খাদেম, মসজিদে ইমামতি করতে হয়েছে তাঁকে।

দুবার তাঁর জেলের আদেশও হয়। প্রথমবার ১৯২৩ খ্রিষ্টাব্দে। ধুমকেতু পত্রিকায় 'আনন্দময়ীর আগমনে' ও 'বিদ্রোহীর কৈফিয়ত' নামে কবিতা ও সম্পাদকীয় লেখার দায়ে। পুরো এক বছর জেল খাটেন তিনি। দ্বিতীয়বার ১৯৩০ খ্রিষ্টাব্দে। প্রলয় শিখা কাব্যগ্রন্থে 'নব ভারতে হলদি ঘাট' নামে কবিতা লেখার জন্য।

এ সময় ছয় মাসের জেলের আদেশ হয় তাঁর। অবশ্য এ যাত্রায় জেল খাটতে হয়নি তাঁকে। এ রায়ের বিরুদ্ধে আদালতে আপিল করলে পরবর্তীতে বাতিল হয়ে যায় তাঁর দণ্ডাদেশ।

কবির জীবনকাল প্রায় ৭৭ বছর হলেও মূলত ১৯২০ খ্রিষ্টাব্দের মার্চ মাস থেকে ১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই জুলাই পর্যন্ত মাত্র ২২ বছর ৪ মাস ছিল তাঁর সাহিত্য সৃজনকাল। এরই মধ্যে আবার ১৯২৫ খ্রিষ্টাব্দে বহরমপুর জেল থেকে ছাড়া পেয়ে প্রত্যক্ষ রাজনীতিতে জড়িয়ে পড়েন তিনি।

কবি ছিলেন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাসের ভক্ত। ১৯২৬ খ্রিষ্টাব্দে বর্তমান বাংলাদেশের ঢাকা, ফরিদপুর, বরিশাল, ময়মনসিংহ নিয়ে তৎকালীন ঢাকা বিভাগের আইনসভায় মুসলিম সংরক্ষিত আসনে নির্বাচনে প্রার্থী হন। এ নির্বাচনে তিনি অবশ্য বিজয়ী হতে পারেননি। তারপর রাজনীতি থেকে নিজেকে গুটিয়ে নেন তিনি।

১৯৪২ খ্রিষ্টাব্দের ৯ই জুলায়ের পর থেকে কঠিন রোগে ভোগেন তিনি। এতে লোপ পায় তাঁর স্বাভাবিক চেতনা। তিনি নির্বাক হয়ে যান। চেতনা হারালেও সুস্থ মানুষের মতো হাঁটাহাঁটি করতে পারতেন কবি। ১৯৭১ খ্রিষ্টাব্দে মুক্তিযুদ্ধ চলাকালে কবি নজরুলের গান ও কবিতা এদেশের মুক্তি পাগল মানুষকে আলোড়িত করে। তাই স্বাধীনতার পর নজরুলকে বাংলাদেশের জাতীয় কবি হিসেবে ঘোষণা করা হয়। শুধু তাই নয়—কবিকে এ দেশে স্থায়ীভাবে নিয়ে আসার চেষ্টা চালানো হয়।

অবশেষে আসে এক শুভদিন। ১৯৭২ খ্রিষ্টাব্দের ২৪শে মে বেলা ১১টা। একটি বিশেষ বিমানে করে কবিকে আনা হয় ঢাকায়। বিমানবন্দর তখন ছিল তেজগাঁও। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের একেবারে কাছে। বিমানবন্দর থেকে অ্যাম্বুলেন্সে করে কবিকে সরাসরি নিয়ে যাওয়া হয় ধানমন্ডির ২৮ নং সড়কের কবি ভবনে।

কবিকে স্থায়ীভাবে ঢাকায় আনার সিদ্ধান্তের পর পরই এ বাড়িটি বরাদ্দ করা হয় কবির জন্য। স্কুল জীবনেই নজরুলের কবিতার প্রতি ভীষণ আকৃষ্ট হই। ঢাকায় নিয়ে আসার পর কবিকে নিজ চোখে দেখতে তাই খুব ইচ্ছে হয়।

১৯৭৪ খ্রিষ্টাব্দের কথা। তখন আমি ঢাকা গভর্নমেন্ট ল্যাবরেটরি হাই স্কুলের ছাত্র। বড়ো বোন হেলেন আপার বাসা তখন শুক্রাবাদে। আপার বাসা থেকে কবি ভবন একেবারে কাছে। এক কিলোমিটারের পথ। ৬ই মে বিকেল সাড়ে ৩টায় আপার বাসা থেকে হেঁটে রওনা দেই কবিকে দেখতে। সাথে এক বন্ধু। বিকেল ৪টায় পৌঁছি কবি ভবনে। দোতলা ভবন। ভবনটির গায়ে তখনো রঙের তাজা গন্ধ। সামনেই কবির জন্মদিন। এখানে-ওখানে ছিটে আছে কাঁচা রং। ভবনটির মূল গেইট একেবারে হা করে খোলা। কোনো গেইটম্যান চোখে পড়েনি। আশপাশের এলাকাটাও একেবারে নির্জন।

খোলা গেইট দিয়ে অবশেষে ভবনে ঢুকি। নীচের তলার বাপাশে ড্রইংরুম। ভেতর থেকে তবলার টুং টাং শব্দ ভেসে আসছে। কেউ মনে হয় ঠিকঠাক করছে তবলা। খোলা ড্রয়িংরুমে এসে আমরা সোফায় বসি। কবিকে নিজ চোখে দেখার ঠিক আগ মুহূর্তে এলোমেলো সব স্বপ্নগুলো চোখে-মুখে ভিড় জমায়। কিন্তু কবিকে দেখার উপায় কী? ভাবছি। কিন্তু কী আশ্চর্য। বলা নেই কওয়া নেই হঠাৎ দেখি কবি স্বয়ং ড্রয়িংরুমে এসে হাজির।

আমরা একেবারে 'থ'। কবি এসে দাঁড়ালেন ঠিক আমার সামনে। অবিরাম তাঁর দুটি ঠোঁট নড়ছে।

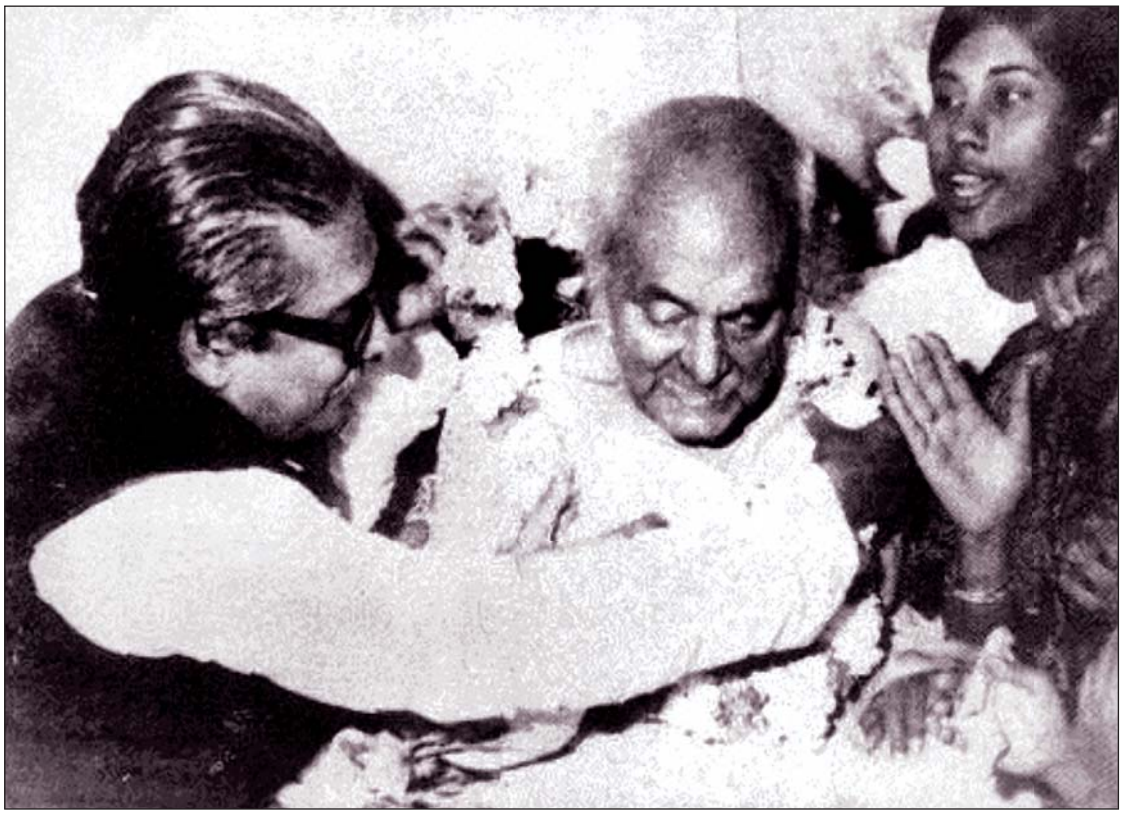

কবিকে দু-হাতে ধরে সোফায় বসাই। সুবোধ বালকের মতো কোনো আপত্তি করেননি কবি।

জীবন্ত কবিকে প্রাণ ভরে দেখছি। পরনে তাঁর সাদা ধুতি। গায়ে হাফ হাতা সাদা গেঞ্জি। মাথার সামনের দিকের চুল শূন্য। পেছনের দিকে দু-পাশে লম্বা সাদা হালকা এক গুচ্ছ করে চুল। কী যেন বলতে চান কবি।

টি-টেবিলে তাকিয়ে দেখি একটি খবরের কাগজ। দৈনিক ইত্তেফাক। কাগজটি হাতে নিয়ে দেই কবির হাতে। সুস্থ মানুষের মতো দু-হাতে কবি ধরলেন কাগজটি। মিনিট দুয়েক হাতে রাখলেন। তারপর হাত থেকে হঠাৎ ছেড়ে দেন। কাগজটি পড়ে যায় ড্রয়িংরুমের মেঝেতে। তারপর বসা থেকে উঠে দাঁড়ান কবি। হেঁটে যান বারান্দায়। বারান্দা থেকে ভবনের লনে।

আমরাও নাছোড়বান্দা। কবির পেছন পেছন যাই। কবি কখনো হাঁটেন। আবার কখনো দাঁড়িয়ে সামনের দিকে তাকিয়ে থাকেন। এক সময় ভবনের ভেতর থেকে একজন ভদ্রমহিলা কবির কাছে এলেন। পরে জেনেছি নাম তার উমা কাজী। কবির পুত্রবধূ।

প্রিয় কবিকে দেখার অদম্য আগ্রহের কথা জানাই তাকে। খুশি হন তিনি। কবির অনেক অজানা কথা তার কাছ থেকে জেনে নিই।

একটু পরে আসেন কবির এক নাতনি। কবির বৈকালিক নাশতা খাওয়ার সময় হয়ে গেছে। কবিকে নিয়ে তারা উভয়ে চলে যান ভবনের ভেতর। আমরাও প্রিয় কবি এবং কবি পরিবারের সদস্যদেরকে বিদায় জানিয়ে পদব্রজে রওনা হই আমাদের গন্তব্যে।

কবিকে দ্বিতীয়বার দেখি ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দে। এ দেখাই শেষ দেখা। পৃথিবী ছেড়ে কবি সেদিন যাত্রা করেন- অনন্তের পথে, শেষ ঠিকানায়।

২৯শে আগস্ট, ১৯৭৬ খ্রিষ্টাব্দ। পিজি (বর্তমান বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিক্যাল বিশ্ববিদ্যালয়) হাসপাতালে লাইফ সাপোর্টে কবি। শারীরিক অবস্থার চরম অবনতির এক পর্যায়ে সকাল ১০টা ১০ মিনিটে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন তিনি।

আমি তখন ঢাকা কলেজের ছাত্র। থাকি উত্তর ছাত্রাবাসে। বেতারে বুলেটিন আকারে কবির মৃত্যু সংবাদ প্রচার করা হচ্ছে একটু পর পর। দর্শনার্থীদের সুবিধার জন্য পিজি হাসপাতাল থেকে কবির লাশ এনে রাখা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের টিএসসিতে। এখানে এসে কফিনে শোয়া কবিকে দেখি।

মাত্র দু'বছর আগে যে কবির সাথে কাটিয়েছি একটি দিনের কিছু মুহূর্ত, সে দিনের ছবি ভেসে উঠে আমার মনের আয়নায়।

কবির মৃত্যু সংবাদ শুনে বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো আসতে থাকে মানুষ। বাড়তে থাকে দর্শনার্থীদের ভিড়। বিকেল সাড়ে ৪টায় জানাজার জন্য কবির লাশ নিয়ে যাওয়া হয় নিকটস্থ সোহরাওয়ার্দী উদ্যানে। এ উদ্যান তখন ছিল বিশাল খোলা মাঠ। এখানে এক সময় ঘোড়দৌড় হতো বলে এর নাম ছিল রেসকোর্স ময়দান। সেখানে তখন ছিল না বড়ো কোনো গাছগাছালি কিংবা কোনো স্থাপনা।

রাষ্ট্রপ্রধান থেকে শুরু করে সর্বস্তরের অগণিত মানুষ অংশ নেয় জানাজায়। ঢাকায় নিযুক্ত বিভিন্ন দেশের কুটনৈতিক মিশনের কর্মকর্তারাও ছুটে আসেন জানাজায় অংশ নিতে।

মসজিদেরই পাশে আমায় কবর দিয়ো ভাইরে- কবির সেই বিখ্যাত গানের মাধ্যমে ফুটে উঠা অন্তিম ইচ্ছার বাস্তবায়নের জন্য পূর্বে নেওয়া সিদ্ধান্ত মতো জানাজা শেষে লাশ দাফনের জন্য আনা হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় মসজিদের পাশে। কবরের পাশে এক প্লাটুন চৌকষ সৈনিক বন্দুকের নল আকাশে উঁচিয়ে ফায়ার করে শ্রদ্ধা জানায় প্রিয় কবিকে। সাথে সাথে বেজে উঠে বিউগলের করুণ সুর।

এরপর শুরু হয় তোপধ্বনি। একুশবারের তোপধ্বনিতে কেঁপে উঠে তামাম ঢাকা শহর।

সেদিন ছিল রমজানের দ্বিতীয় দিন। ঘড়িতে তখন বিকেল ৫টা।

বাংলাদেশের মানুষের প্রাণের কবি ও জাতীয় কবি নজরুলকে রাষ্ট্রীয় গৌরবে সমাহিত করা হয় শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদীনের সমাধির পাশে। প্রিয় কবি, প্রাণের কবি কাজী নজরুলকে সমাহিত করার পর ভারাক্রান্ত পায়ে হেঁটে রওনা হই ঢাকা কলেজের উত্তর ছাত্রাবাসের উদ্দেশ্যে। ■

নিবন্ধ

রংধনু খাবারের গল্প

শাহিদা সুলতানা

[দ্বিতীয় পর্ব]

ছোট্ট বন্ধুরা, কেমন আছ তোমরা সবাই? এসো আজকে আমরা বিভিন্ন খাবারের গল্প করি, কি বলো?

তোমরা কি রংধনুর সাতটি রঙের নাম জানো? বেগুনি, নীল, আকাশি, সবুজ, হলুদ, কমলা ও লাল (বেনিআসহকলা) এই রংগুলো নিয়েই বৃষ্টি শেষে রংধনু আকাশে দেখা যায়। গত পর্বে রংধনুর বেশ কয়েকটা রঙের খাবারের কথা জেনেছ তোমরা। আশা করি সেই রঙিন খাবারগুলো খেতে শুরু করেছ সবাই। আজকে চল, আরো কিছু রঙিন খাবারের কথা শুনি।

নীল, বেগুনি, গোলাপি এবং লাল খাবার তোমার শরীরকে ক্যান্সারের বিরুদ্ধে সবল রাখে, যে-কোনো ফোঁড়া, ঘা, ব্যথা ইত্যাদি থেকে রক্ষা করে। এজন্য তুমি খেতে পারো বেগুন, বরই, আলুবোখারা, ডুমুর, লাল আঙুর, লাল বাঁধাকপি, ব্লু বেরি (জাম), ব্লাক বেরি ইত্যাদি। এত যে খাবারের নাম বললাম তার মধ্যে কয়টি ফল বা সবজি তোমার চেনা? বা কয়টি গাছ তুমি দেখেছ? বাবা-মাকে নিয়ে ফল বা সবজি কিনতে যেতে পারো, যেতে পারো নার্সারি বা বাগানে যেখানে তুমি গাছ চিনতে পারো অথবা যেতে পারো কোনো কৃষকের কাছে।

আর কী বাকি থাকল ছোট্ট বন্ধুরা? সাদা ও বাদামি রং...!! জানো তো সব রঙের মিশ্রণে হয় সাদা। সাদা আর বাদামি রঙের সবজি এবং ফল তোমার হাড়কে শক্ত রেখে তোমাকে অনেক শক্তি দেয় যেন তুমি সারাদিন বন্ধুদের সাথে খেলাধুলা করতে পারো। সারাদিন মোবাইল, গেম্‌স এবং টেলিভিশন দেখলে এসব খাবার তোমার কোনো কাজেই আসবে না। বেশি বেশি মোবাইলে গেমস্ খেললে তোমার চোখের, মাথার ক্ষতি হবে, পড়াশোনার ক্ষতি করবে আর সেই সাথে বাবা-মায়ের বকুনি তো আছেই! কোন খাবারটা তোমার খেতে ভালো লাগে ফুলকপি, আলু, পেঁয়াজ, রসুন, মাশরুম, মূলা ইত্যাদি থেকে বেছে নাও তোমার পছন্দের খাবার।

রংধনু খাবারের নাম তো জানলে কিন্তু কীভাবে খাবে সেটাও জেনে নাও। বাবা-মা, বড়ো ভাইয়া, আপুর সাহায্যে তুমি প্রতিদিন রংধনু খাবার খেতে পারো। সকালের নাশতা অবশ্যই করবে, নাশতা না করে খালি পেটে স্কুলে যাবে না। চেষ্টা করবে প্রিয় কোনো রঙের খাবার খেতে। বিভিন্ন ধরনের ফল মিলিয়ে খেতে পারো। দুপুরের খাবারে মাছ, মাংসের সাথে সবজিও খাবে।

শুধু সবজি আর ফলের কথা শুনতে ভালো লাগছে না তাই না? এবার বলোতো মাছ না মাংস, বড়ো মাছ না ছোটো মাছ, ডিম, দুধ— কোনটা তুমি একদমই খেতে চাও না? তোমার কি প্রতিদিন ফাস্টফুট খেতে বাইরে যেতে ইচ্ছে হয়? তাহলে তো বিপদ!! কারণ এ খাবারগুলো তোমাকে আস্তে আস্তে অসুস্থ করে ফেলবে। তার চেয়ে বরং মাকে যদি ঘরেই এসব খাবার বানাতে সাহায্য করো তাহলে ঘরেই খেতে পারবে পছন্দের খাবার।

ছোট্ট বন্ধুরা, তোমাদের প্রতিদিন সুষম খাবার খাওয়া প্রয়োজন। দুধ একটি আদর্শ খাবার। মা দুধ খেতে দিলে তা বেসিনে ফেলে দেওয়া চলবে না কিন্তু নিয়মিত ডিম খেতেই হবে, সেটা সিদ্ধ করে, পোচ করে, মামলেট করে খেতে পারো। এছাড়া দুধ ও ডিমের তৈরি বিভিন্ন খাবার তোমাকে সুস্থ রাখতে সাহায্য করবে।

প্রতিদিন ৯ ধরনের পুষ্টিকর খাবার খেলে তোমার স্বাস্থ্য ভালো থাকবে। সে বিষয়ে বাবা-মা যেমন খেয়াল রাখবেন তেমনি ছোট্ট বন্ধুরা তোমরাও বাবা-মাকে সাহায্য করবে।

প্রোটিন বা আমিষ : প্রোটিন শরীরের কোষ তৈরিতে সাহায্য করে, খাবারকে শক্তিতে রূপান্তর করে। যে-কোনো সংক্রমণের বিরুদ্ধে লড়াই করে, অক্সিজেন বহন করে। তোমাদের কি জানতে ইচ্ছে হচ্ছে কোন কোন খাবারে প্রোটিন আছে? মাছ, মাংস, দুধ, ডিম, বাদাম এবং দুধের বানানো খাবার, শিম— এসবে প্রয়োজনীয় প্রোটিন পাবে।

কার্বোহাইড্রেট বা শর্করা : শরীরের শক্তির সবচেয়ে বড়ো উৎস হলো শর্করা। শরীরের মাংসপেশি তৈরিতে সাহায্য করে শর্করা। যে-সব খাবারে শর্করা পাবে— সেগুলো হলো ভাত, রুটি, বিভিন্ন ধরনের শস্য যেমন: গম, যব, ভুট্টা, আলু ইত্যাদি।

ফ্যাট বা চর্বি : ফ্যাট বা চর্বি তোমার শক্তির অন্যতম উৎস এটি এবং শরীরে সহজেই জমা হয়। খাবারের অন্যান্য উপাদান শরীরে ব্যবহারের জন্য চর্বির প্রয়োজন আছে। যে-সব খাবারে ফ্যাট বা চর্বি আছে সেগুলো হলো : পূর্ণ ননীযুক্ত দুধ, দুধের খাবার, রান্নার তেল, মাংস, মাছ, বাদাম ইত্যাদি।

ক্যালসিয়াম— হাড় এবং দাঁত শক্তিশালী করার জন্য যেমনি ক্যালসিয়াম অত্যন্ত প্রয়োজন। তেমনি শরীরের রক্ত জমাট বাঁধা, স্নায়ু, পেশি এবং হৃদপিণ্ডের জন্য ও খুব দরকার। দুধ, পনির, দই, ডিমের কুসুম, আইসক্রিম, ব্রকলি, পালংশাক ইত্যাদি ক্যালসিয়ামের ভালো উৎস।

আয়রন : রক্তের মাধ্যমে দেহে অক্সিজেন প্রবাহ বাড়ানোর জন্য আয়রন অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। দেখা যাক আয়রনযুক্ত কী কী খাবার আছে— গরু ও খাসির মাংস, কলিজা, মুরগি, বিভিন্ন শস্যদানা, শিমের বিচি, বাদাম, কচু, ইত্যাদি খাবারে আয়রন আছে।

ফলেট বা ফলিক এসিড– আট ধরনের ভিটামিন বি আছে, যার মধ্যে অন্যতম হলো ফলেট বা ফলিক এসিড। এর অভাবে শরীরের রক্তস্বল্পতা (অ্যনিমিয়া) দেখা দেয়। যে-সব খাবার ফলিক এসিড তৈরিতে সাহায্য করে সেগুলো হলো - শস্যদানা, বিভিন্ন ধরনের ডাল, মটরশুটি, ছোলা, ইত্যাদি। ফাইবার বা আঁশযুক্ত খাবার হজমে সাহায্য করে শরীর সুস্থ রাখে।

ভিটামিন এ : ভিটামিন এ শিশু এবং বয়স্কদের শরীরে বিভিন্নভাবে উপকার করে। এটি শরীরের বৃদ্ধিতে সাহায্য করে, কম এবং বেশি আলোতে দেখতে চোখকে সাহায্য করে, ত্বক সুস্থ রাখে এবং যে-কোনো সংক্রমণ থেকে শরীরকে সুরক্ষা দেয়। যে-সব খাবারে অনেক বেশি ভিটামিন এ আছে সেগুলো হলো–গাজর, মিষ্টি আলু, স্কোয়াশ, বাঁধাকপি, মাছের তেল, ব্রকলি, ডিমের কুসুম ইত্যাদি।

ভিটামিন সি : ভিটামিন সি সাধারণ ঠান্ডার থেকে শরীরকে রক্ষা করার চাইতেও বেশি কাজ করে এবং শরীরের কোষগুলোকে একত্রিত রাখে। রক্তনালীর পেশি শক্তিশালী করে, যে-কোনো ক্ষত শুকাতে শরীরকে সাহায্য করে। হাড় ও দাঁতকে মজবুত করতে ভিটামিন সি সাহায্য করে। যে-সব খাবারে ভিটামিন সি পাবে সেগুলো হলো– টক জাতীয় ফল, স্ট্রবেরি, টমেটো, আলু, তরমুজ, আম, ব্রকলি, ফুলকপি, বাঁধাকপি, পেঁপে ইত্যাদি।

আমাদের দেশে গ্রীষ্মকালে আম, জাম, কাঁঠাল, লিচু, তরমুজ, বাঙ্গি, গাব, জামরুল, আনারস, পেঁপে, পেয়ারা ইত্যাদি ফল পাওয়া যায়। এছাড়া সারা বছরই কলা, ডাব পাওয়া যায়। বর্ষাকালে পেয়ারা, জাম্বুরা, কামরাঙা, আমড়া, আমলকি ইত্যাদি ফল পাওয়া যায়। শীতকালে বিভিন্ন ধরনের শীতকালীন সবজি পাওয়া যায়। তোমরা চেষ্টা করবে নিয়মিত দেশীয় ফল এবং সবজি খেতে। মাঝে মাঝে বাইরের খাবার খেতে মন চাইলে খাবে, কিন্তু ঘরে তৈরি খাবার সবচেয়ে ভালো। নিয়মিত দুধ, ডিমসহ রংধনু খাবার খেলে এবং নিয়মিত খেলাধুলা করলে তোমরা বেড়ে উঠবে সুস্থ সুন্দর হয়ে। ■

আমার মা

নাহার আহমেদ

কেমন করে কার সাথে তার
করবো তুলনা।
সে যে আমার জন্মভূমি
আমার বাংলা মা।
পদ্ম ফোটা শীতল দিঘির
শীতল জলের ছায়ে।
যাই সেখানে ভোরের বেলা
শিশির ভেজা পায়ে।
সবুজ শাড়ির আঁচল দিয়ে
হৃদয় খানি ঢাকা।
বর্ণমালার মধুর স্বরে
যায় যে তারে ডাকা।
ছয়টি ঋতু বর্ণালি রং
সাজিয়ে নিয়ে আসে।
মুক্ত স্বাধীন মা যে আমার
ঝিলমিলিয়ে হাসে।

আমার দেশ

ইশরা হোসেন

আমার দেশ বাংলাদেশ
সোনার চেয়েও খাঁটি।
আমার দেশ বাংলাদেশ
নদীনালায় ভরা।
আমার দেশ বাংলাদেশ
শাপলা শালুক পদ্মাতে
অপরূপ মনকাড়া।
আমার দেশ বাংলাদেশ
মনোরম তার বেশ।
আমার দেশ বাংলাদেশ
জুড়ায় সবার আঁখি।

একাদশ শ্রেণি, আইডিয়াল স্কুল অ্যান্ড কলেজ মতিঝিল, ঢাকা।

অর্কর বদলে যাওয়া

মৌমিতা ধর লোপা

মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙে অর্কর। মোটাসোটা শরীরটা নিয়ে অনিচ্ছা সত্ত্বেও উঠে পড়ল সে। ব্রেকফাস্টের টেবিলে প্রিয় স্যান্ডউইচ গোগ্রাসে গিলল। এরপর স্কুলে যাওয়া। ঢাকার একটা নামকরা স্কুলে ক্লাস ফাইভে পড়ে সে। অথচ বেশ কয়েক মাস ধরে স্কুল থেকে অভিযোগ আসছে ক্লাসে অর্ক বেশ অমনোযোগী। খেলাধুলাও ঠিকমতো করে না। অর্কর মা বেশ চিন্তায় পড়ে যান। ছেলের কোনো অস্বাভাবিকতা তার তেমন চোখে পড়েনি। ছেলে ফাস্টফুড খেতে পছন্দ করে, মা তাকে খুশি করার জন্য ইচ্ছেমতো ফাস্টফুড কিনে দেন। ছেলে বার্গার, স্যান্ডউইচ, চিকেন ফ্রাই ছাড়া কিছু মুখেই তোলে না। ছেলে নাদুসনুদুস দেখতে বলে মা খুশি। তবে ইদানীং অর্কর রেজাল্ট খারাপ হচ্ছে, সারাক্ষণ অবসাদে ভোগে সে। বাইরে কারো সাথে মেশে না। রুমে বসে শুধু কম্পিউটারে গেম খেলাই তার একমাত্র আগ্রহ। মা এবার চিন্তায় পড়ে যান। অর্ককে নিয়ে যান নামকরা শিশু বিশেষজ্ঞ ডা. অন্বেষার কাছে।

সব কথা মন দিয়ে শোনার পর ডা. অন্বেষা অর্কর মা কে বললেন, অর্কর ওজন স্বাভাবিকের তুলনায় অনেক বেশি, ওর খাওয়াদাওয়ার রুটিন পরিবর্তন করতে হবে। সব রকমের ফাস্টফুড খাওয়া বন্ধ, খুব ইচ্ছে হলে মাসে একবার খাওয়া যেতে পারে। সকালে ফাস্টফুডের বদলে রুটি সবজি খাবে, টিফিনে ডিম, তাজা ফল, আর বাসায় এসে ভাতের সাথে সবজি, ডাল, ছোটো-বড়ো মাছ বা মাংস। সন্ধ্যায় পড়তে বসার আগে এক গ্লাস দুধ। আর কম্পিউটার গেম বাদ দিয়ে অবশ্যই বন্ধুদের সাথে খেলতে হবে।

এক সপ্তাহ পর অর্ককে নিয়ে আবার এলেন ডাক্তারের কাছে। অর্ককে নতুন খাদ্যাভ্যাসে আনতে খুব বেগ পেতে হচ্ছে। সে কিছুতেই ফাস্টফুড ছাড়তে চাইছে না। ডা. অন্বেষা এবার অর্কর সাথে বসলেন। বললেন, অর্কবাবু, তুমি কি জানো এসব ফাস্টফুড খেলে কী হতে পারে? অর্ক মাথা নাড়ে। ডা. অন্বেষা বলতে থাকেন, তুমি যদি এখনি এগুলো খাওয়া ছাড়তে না পারো, খুব তাড়াতাড়ি তুমি আরো মোটা হয়ে যাবে, তখন অল্প বয়সেই তোমার ডায়াবেটিস, হাইপ্রেসার, হাই কোলেস্টেরল হয়ে যাবে, হার্টের অসুখ করবে। তুমি তখন নিজের আর নিজের পরিবারের কষ্টের কারণ হবে। তোমার রেজাল্ট খারাপ হবে। এগুলো যাতে না হয় সেজন্য এখন থেকেই তোমাকে সচেতন হতে হবে, তাই না? অর্ক ডা. আন্টিকে প্রমিস করল তার সব কথা সে শুনবে।

এক মাস পর... অর্ক এখন আর ফাস্টফুড খায় না, ডা. আন্টিকে করা প্রমিস সে রেখেছে। সে এখন তার ক্লাসের সেরা ছাত্র। টিফিনে ফাস্টফুড নেওয়া বন্ধ করায় প্রথম দিকে তার বন্ধুরা হাসাহাসি করলে সে তাদেরকে ডা. আন্টির কথাগুলো বলেছে। এরপর ওর দেখাদেখি সবাই এখন ফাস্টফুড খাওয়া কমিয়ে দিয়েছে। ওরা এখন কম্পিউটার গেম খেলার বদলে সবাই একসাথে খেলাধুলা করে। সবাই এখন স্বাস্থ্যকর জীবনযাপন করে। ■

নিবন্ধ

বজ্রপাত

আব্দুস সালাম

তোমরা অনেকেই হয়ত লক্ষ করেছ ঝড়বৃষ্টির সময় কিংবা এর আগে পরে আকাশে হঠাৎ বিদ্যুতের ঝলকানি। এর কিছুক্ষণ পরেই বিকট শব্দ। এটাকেই আমরা বজ্রপাত বলি। এই বজ্রপাত খুব ভয়ংকর। বজ্রপাতের আঘাতে মানুষের মৃত্যু ঘটে। বজ্রপাতের কারণ কী জিজ্ঞাসা করলে তোমরা হয়ত অনেকেই বলবে মেঘে মেঘে সংঘর্ষের ফলে বজ্রপাত হয়। এই ধারণা সঠিক নয়। এখন তোমাদের বলব এই বজ্রপাত কেন হয়।

পানিচক্রের নিয়মে জলাধারের পানি বাষ্পীভূত হয়ে মেঘ আকারে আকাশে আশ্রয় নেয়। বাষ্প যখন উপরের দিকে উঠতে থাকে তখন অন্যান্য বায়ু ও জলীয় কণার সাথে ঘর্ষণের ফলে বিদ্যুৎ তৈরি হয়। ফলে একেকটা জলীয় কণা ব্যাটারির মতো কাজ করে। বজ্রপাতের জন্য দায়ী মেঘ বৈদ্যুতিক চার্জের আধারের মতো আচরণ করে। ইলেক্ট্রন জলীয় কণার নিচের দিকে বেশি অবস্থান করে বলে এই অংশে ঋণাত্মক চার্জ জমা হয় আর উপরে ধনাত্মক চার্জ জমা হয়। যখন এই ধনাত্মক ও ঋণাত্মক চার্জ মিলিত হয় তখনই বজ্রের সৃষ্টি হয়।

মেঘের বিপুল শক্তিশালী বিদ্যুৎ ক্ষেত্র তার চারপাশের বাতাসের অপরিবাহী ধর্মকে নষ্ট করে দেয়। যাকে বলে Dielectric Breakdown। মেঘে অবস্থিত বিদ্যুৎক্ষেত্র যখন যথেষ্ট শক্তিশালী হয় (প্রতি ইঞ্চিতে প্রায় ১০,০০০ ভোল্ট), তখন তার আশপাশের বাতাস পজিটিভ এবং নেগেটিভ চার্জে বিভক্ত হয়ে যায়। এই আয়নিত বাতাস প্লাজমা নামেও পরিচিত।

বাতাস আয়নিত হয়ে মেঘ এবং ভূপৃষ্ঠের মধ্যে বিদ্যুৎ চলাচলের পথ বা শর্ট সার্কিট তৈরি করে দেয় এবং বজ্রপাত ঘটায়। এই সময় তড়িৎ বিভবের পার্থক্য ১০ মিলিয়ন ভোল্ট পর্যন্ত হতে পারে আর তড়িৎ প্রবাহের মাত্রা ৩০,০০০ অ্যাম্পিয়ার পর্যন্ত হতে পারে। বিভবের পার্থক্যের উপর প্রবাহের মাত্রা নির্ভর করে। এই সময় বাতাসের তাপ মাত্রা ২০০০০ থেকে ৩০০০০ ডিগ্রি সেলসিয়াস পর্যন্ত বেড়ে যায়। এই প্রচণ্ড শক্তির স্থায়িত্ব মাত্র সেকেন্ডের দশ ভাগের এক ভাগ।

কেউ যদি বজ্রপাতের মধ্যে পড়ে তাহলে সাথে সাথে সে মারা যাবে। তবে আশার কথা হলো মোট বজ্রপাতের মাত্র ২৫ ভাগ ভূপৃষ্ঠে পড়ে আর বাকিগুলো মেঘের মধ্যেই ঘটে থাকে। যখন মেঘের মধ্যে ধনাত্মক আর ঋণাত্মক চার্জ মিলিত হয় তখন তা মেঘের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়। এই সময় মেঘের জলকণা ভেঙে অক্সিজেন আর হাইড্রোজেনের এক বিস্ফোরণ ঘটে। ফলে প্রচণ্ড শব্দ তৈরি হয়। শব্দ আর বিদ্যুৎ একই সাথে তৈরি হলেও বিদ্যুতের গতি বেশি হওয়ার কারণে আমরা আলো আগে দেখতে পাই আর পরে শব্দ শুনতে পাই।

বিশ্বে বজ্রপাতপ্রবণ এলাকার মধ্যে বাংলাদেশের অবস্থান অন্যতম। মার্চ থেকে মে–এই তিন মাসে সবচেয়ে বেশি বজ্রপাত হয় সুনামগঞ্জে। এশিয়ায় বজ্রপাতপ্রবণ এলাকার মধ্যে বাংলাদেশের নোয়াখালীর অবস্থান পঞ্চম। যুক্তরাষ্ট্রের মহাকাশ সংস্থা নাসা ও মেরিল্যান্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের এক গবেষণায় এই তথ্য উঠে এসেছে। স্যাটেলাইট থেকে নেওয়া ১০ বছরের তথ্য বিশ্লেষণ করে এই গবেষণা করা হয়েছে।

দেশে বজ্রপাতের সংখ্যা প্রতিবছরই বাড়ছে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের হিসাবে ২০১৪ সালে সারা দেশে ৯১৮টি বজ্রপাত আঘাত হেনেছিল, ২০১৫ সালে ১ হাজার ২১৮টি, ২০১৬ সালে তা দেড় হাজার ছাড়িয়ে গেছে।

বজ্রপাত থেকে কীভাবে বাঁচতে পারি

❑ বজ্রপাতের সময় তোমরা কেউ বাইরে বের হবে না। সবসময় বাসাবাড়ির মধ্যে অবস্থান করবে।

❑ বাড়িতে থাকলে জানালার কাছাকাছি থাকবে না। জানালা বন্ধ করে রাখবে।

❑ রাস্তায় কিংবা খোলা মাঠে থাকাকালীন এমন পরিস্থিতি সামনে পড়লে পাকা বাড়ির নিচে আশ্রয় নেবে।

❑ বজ্রপাত ও ঝড়ের সময় তোমরা কেউ বাড়ির ধাতব কল, সিঁড়ির রেলিং, পাইপ, বৈদ্যুতিক সংযোগযুক্ত সব যন্ত্রপাতি ইত্যাদি স্পর্শ করবে না। এমনকি ল্যান্ড লাইন টেলিফোনও স্পর্শ করবে না। বজ্রপাতের সময় এগুলোর সংস্পর্শ থেকে দূরে থাকতে হবে।

❑ গাড়ির ভিতরে থাকলে গাড়ির কাচে হাত দেবে না।

❑ আর হ্যাঁ তোমরা বজ্রপাতের সময় কেউ পানিতে সাঁতার কাটবে না।

❑ কেউ খালি পায়ে হাঁটাহাঁটি করবে না। এ সময় বিদ্যুৎ অপরিবাহী রাবারের জুতা ব্যবহার করা সবচেয়ে নিরাপদ।

এখন বর্ষাকাল। যে-কোনো সময় ঝড়বৃষ্টি হতে পারে। বজ্রপাত হতে পারে। তোমরা বজ্রপাত থেকে অবশ্যই সাবধান থাকবে। ■

দাদু বাড়ি

হালিমা খাতুন বাবুনী

দাদি আমায় ফোন করেছে
জলদি বাড়ি আয়
আম-কাঁঠালে পাক ধরেছে
কাঠবিড়ালি খায়।

পুবের গাছে জাম পেকেছে
কেমনে রাখি ধরে
পচে গলে নষ্ট হয়
মন যে কেমন করে।

পুকুর পাড়ে তিনটা গাছে
কচি কচি তাল
লাল টুকটুক লিচুর ভারে
নুয়ে আছে ডাল।

আমরা সবাই হল্লা করে
যাচ্ছি দাদু বাড়িতে
চিতই পিঠা ফিরনি দধি
ঘুমায় দাদুর হাঁড়িতে!

মুহতাসিম আরিফ কাজিত, প্রথম শ্রেণি,
আলমজী ক্যান্টনমেন্ট পাবলিক স্কুল, ঢাকা

গল্প

দাদু বাড়িতে

শেহ্‌জাদী ফারহা অর্থি

ছুটিতে দাদু বাড়ি এসেছি। দাদু আমাকে তেলপিঠা বানিয়ে দিয়েছেন। তেলপিঠা আমার খুব পছন্দের। দাদা ভাই আমাকে অনেক গল্প শুনিয়েছেন। সকালে বাবার সাথে বড়ো মা ও বড়ো বাবার কবর জিয়ারতে গিয়েছি।

বাড়িতে কাঁঠাল গাছে মুচি ধরেছে। বাবা বলেছে ছোটো কাঁঠালকে মুচি বলে। আমগাছ দেখেছি। আমগাছে মুকুল ধরেছে। আমের মুকুল দেখতে সোনালি। লেবু গাছ দেখেছি। পেঁপে গাছ ও পুঁইশাকের গাছ দেখেছি। পুঁইগাছের পাকা বিচির রং বেগুনি। সে বিচি দিয়ে হাত রাঙিয়েছি। বাবা ছোটো মেহগনি পাতা দিয়ে আমার একহাত রং করে দিয়েছেন। সে রং মেহেদির রঙের মতো। কুল গাছ, লিচু গাছ ও লাউ গাছ দেখেছি। দাদু বাড়ির উঠানে অনেক লাউয়ের মাচা। ঘরের সামনে বড়ো জায়গাটাকে উঠান বলে। আর দেখেছি সুন্দর লাল শিমুল ফুল।

আমাদের দাদু বাড়িতে দুটো অনেক বড়ো পুকুর আছে। পুকুর থেকে মাছ ধরেছি। রুই মাছ, মৃগেল মাছ, পুঁটি মাছ, চিংড়ি মাছ পুকুরে লাফায়। দাদু বাড়িতে তিনটা বিড়াল আছে। এদের নাম হুলো, মিনি ও পুষি। ভাত খেতে বসলে ওরা গায়ে লেজ ঘষে। দুটো কুকুর আছে। ওরা রাতের বেলা বাড়ি পাহারা দেয়।

দাদু বাড়িতে মুরগি ডিম ফুটিয়েছে। পনেরোটা ছানা। বেশ তুলতুলে। ছোট্ট একটা ছাগলছানা আছে। কালো রঙের। খয়েরি রঙের হাম্বার বাছুর আমার হাত চেটে দিয়েছে। আমি বাছুরকে তেলপিঠা খাইয়ে দিয়েছি। আগামীকাল আমরা ঢাকায় চলে যাব। ঢাকার চেয়ে দাদু বাড়িটাই আমার খুব পছন্দের। ■

[এই লেখাটা আমার কন্যার উপলব্ধি। সে যা যা বলেছে, আমি তাই হুবহু লিখতে চেষ্টা করেছি অনুলেখক হিসেবে হাসান ইকবাল।]

ভাষা-দাদুর সঙ্গে

বাংলা ভাষার বংশ

তারিক মনজুর

‘ভাষার আবার বংশ হয় নাকি!’ নেহা খুব অবাক হয়, ‘বংশ তো হয় শুধু মানুষের।’

‘হয়, হয়। ভাষারও বংশ হয়।’ ভাষা-দাদু মাথা ঝাঁকিয়ে বলেন, ‘অনেক সময় এক ভাষার সাথে আরেক ভাষার মিল থাকে। এই মিল দেখে মানুষ অনুমান করে নিয়েছে, নিশ্চয়ই ওই ভাষাগুলো একই বংশ থেকে এসেছে।’

‘তা বাংলা ভাষার বংশের নাম শুনি!’ নেহার বন্ধু বিনু বলে, ‘চৌধুরী বংশ নাকি মোড়ল বংশ?’

বিকেলবেলা। নেহা আর বিনু দুজনে গাছতলায় বসে ছিল। ওদেরকে দেখে ভাষা-দাদু টুকটুক করে এগিয়ে আসেন। তারপর শুরু হয়ে যায় ভাষার বংশ নিয়ে আলাপ।

ভাষা-দাদু বলেন, ‘এই বংশের নাম চৌধুরীও না, মোড়লও না। বাংলা ভাষার বংশের নাম ইন্দো-ইউরোপীয় বংশ।’

‘এ আবার কেমন বংশ!’ বিনু ঠোঁট উলটিয়ে বলে।

ভাষা-দাদু বলেন, ‘ইন্দো-ইউরোপীয় নামটা হয়েছে জায়গার নাম থেকে। এখানে ইন্দো মানে ইন্ডিয়া। আর ইউরোপ মানে তো ইউরোপই।’

‘কিন্তু এ রকম বিদঘুটে নাম দিলো কেন, দাদু?’ নেহা জানতে চায়।

‘একদিন মানচিত্র দেখাব তোমাদেরকে। দেখবে, পৃথিবীর পূর্ব দিকে আছে ইন্ডিয়া। আর পশ্চিম দিকে ইউরোপ। ইন্ডিয়া থেকে ইউরোপ পর্যন্ত বিশাল অঞ্চল। এই বিশাল অঞ্চলের বেশিরভাগ ভাষা এসেছে ইন্দো-ইউরোপীয় বংশ থেকে।’

‘তার মানে বাংলা এসেছে যে বংশ থেকে, ইংরেজিও এসেছে সেই বংশ থেকে?’ নেহা প্রশ্ন করে।

‘না, না, এটা তো হতেই পারে না।’ বিনু মানতে চায় না।

‘বাংলা আর ইংরেজি দুটো ভাষাই ইন্দো-ইউরোপীয়

বংশ থেকে এসেছে। একটু ধরিয়ে দিলে তোমরাও বুঝতে পারবে।' এই বলে ভাষা-দাদু ছড়া কাটতে থাকেন –

'ভোর হলো দোর খোলো
খুকুমনি ওঠো রে,
ওই ডাকে জুঁই শাখে
ফুলখুকি ছোটো রে...'

'এ কী, দাদু!' বিনু বলে, 'ধরিয়ে দেওয়ার কথা বলে তুমি দেখি ছড়া কাটতে শুরু করলে!'

ভাষা-দাদু হেসে ফেলেন। বলেন, 'এই ছড়ার মধ্যে সব রহস্যের সমাধান রয়েছে।'

'মানে? মানে?' ওরা দুজন খুব কৌতূহলী হয়ে ওঠে, 'ছড়ার মধ্যে রহস্যের সমাধান!'

ভাষা-দাদু ব্যাখ্যা করে চলেন, 'ভোর হলো দোর খোলো ... এই 'দোর' মানে কী জানো?'

'জানব না কেন?' নেহা বলে, 'দোর মানে দরজা।'

'ইংরেজিতে একে কী বলে, নেহা?'

নেহা বলার আগেই বিনু বলে ওঠে, 'ইংরেজিতে দোর-কে বলে ডোর।'

হা হা হা করে ভাষা-দাদু হেসে ওঠেন। তারপর বলতে থাকেন, 'দোর-ডোর, দোর-ডোর, দোর-ডোর ...'

বিনু একটু অবাক হয়েই বলে, 'দোর-ডোর, দোর-ডোর এমন করছ কেন, দাদু?'

দাদু আবার 'দোর-ডোর, দোর-ডোর' করতে করতে বলেন, 'বাংলা দোর আর ইংরেজি ডোরের মধ্যে কতখানি মিল দেখেছ?'

'হ্যাঁ, তাই তো!' দুজনেই একসঙ্গে বলে ওঠে।

ভাষা-দাদু ওদেরকে আরো অবাক করে দিয়ে বলেন, 'এ রকম শব্দ আরো আছে। বাংলায় বলি 'নাম', ইংরেজিতে বলে 'নেম'। বাংলায় বলি 'ত্রি', ইংরেজিতে বলে 'থ্রি'। বাংলায় বলি 'উপর', ইংরেজিতে বলে 'আপার'। বাংলায় বলি 'পথ', ইংরেজিতে বলে 'পাথ'।...

'বলো কী, দাদু!' বিনু বলে, 'বাংলা হলো ভারতবর্ষের ভাষা, আর ইংরেজি হলো ইউরোপের ভাষা। এদের মধ্যে এত মিল!'

'শুধু একটা-দুইটা শব্দে না, হাজার হাজার শব্দে এ রকম মিল রয়েছে।' ভাষা-দাদু বলতে থাকেন, 'এই মিল দেখেই মানুষ ধারণা করেছে, ভারতের ভাষা আর ইউরোপের ভাষা নিশ্চয়ই এক বংশ থেকে এসেছে। আর এর একটা কাল্পনিক নামও দেওয়া হয়েছে– ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বংশ।'

দুজনে অবাক হয়ে শোনে। ভাষা-দাদুর কথা শেষ হলে নেহা বলে, 'এক সময় মনে হয় ইউরোপের মানুষ আর ভারতের মানুষ এক জায়গায় বাস করত। তাই না, দাদু?'

'ঠিক তাই! এমনটাই মানুষের ধারণা। এশিয়া-ইউরোপের মাঝামাঝি জায়গায় পাঁচ হাজার বছর আগে মানুষ একসাথে বাস করত। সেখান থেকে একদল মানুষ চলে গেল ইউরোপের দিকে। আরেক দল মানুষ চলে এল ভারতের দিকে। আর এভাবেই ইন্দো-ইউরোপীয় বংশের দুটি শাখা তৈরি হলো – যার একটির নাম কেন্তুম, আরেকটির নাম শতম।'

ভাষা-দাদু হয়ত আরো কিছু বলতেন। কিন্তু সন্ধ্যা হয়ে আসায় তিনি উঠে দাঁড়ান। আর নেহা ও বিনুকে নিয়ে বাসার দিকে হাঁটতে থাকেন। ■

তোমাদের পত্রিকা নতুন রূপে

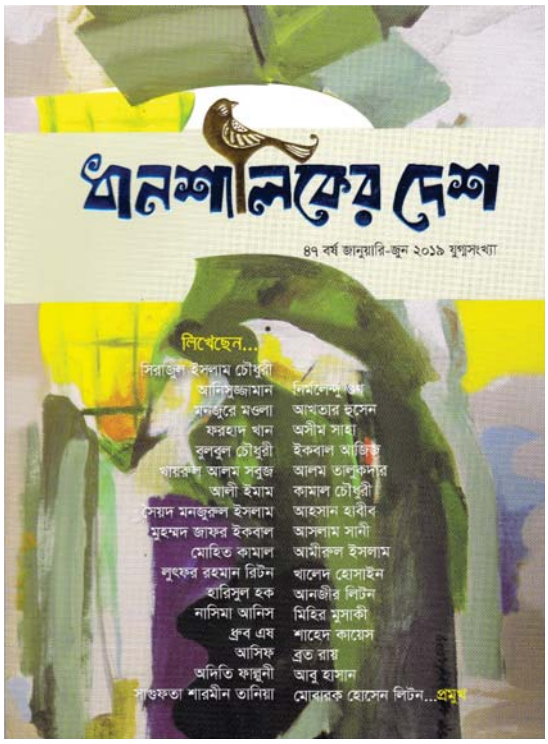

ক...
বলে ওঠে কাক

মো. রহমত উল্লাহ্

আলো ঝলমল বিকেলবেলা। গ্রামের পথে হাঁটছে তিনজন। রাকিব, সাকিব ও লুহাম। খেলতে যাবে সবুজ পাহাড় মাঠে। গুড়ুম করে আওয়াজ হয় বিদ্যুতের তারে। চোখে লাগে আগুনের ঝিলিক। ঝপ করে নিচে পড়ে একটি কাক। কা কা, কা কা! ডেকে উঠে কয়েকটি কাক। কা কা করে আসতে থাকে আরো। ডাকতে থাকে কর্কশ গলায়। বাড়তে থাকে কা কা, কা কা! আসতে থাকে আরো কাক। কা কা কা! বাড়তে থাকে ডাকাডাকি। বাড়তে থাকে ছুটোছুটি। যেন কাকদের প্রতিবাদী মিছিল। ভয়ে দৌড়ে পালায় রাকিব ও সাকিব। তবে পালায় না লুহাম। সে ছুটে যায় সেই কাকের কাছে। দেখে, মাটিতে পড়ে আছে কাক। অপলক তাকিয়ে থাকে কাকের দিকে। ভাবে, কী করা যায়?

কাকের কাছে বসে লুহাম। হাতে তুলে নেয় কাকটিকে। কঠিন হয়ে আছে কাকের শরীর। নড়াচড়া করছে না মোটেও। কালো চোখ যেন পাথর। কুঁকড়ে আছে পায়ের আঙুল। বাঁকা হয়ে আছে ছাই রং ঘাড়। হা হয়ে আছে দুটি ঠোঁট। লাল দেখা যায় মুখের ভিতর। পাখা ও লেজ হয়ে আছে এলোমেলো। যেন, ছেঁড়া ছাতার কালো কাপড়। মনে হয়, আর বেঁচে নেই কাক! কারণ বুঝতে পারে লুহাম। বিদ্যুৎ শকেই এমন হয়েছে কাকের। ভাবে, কী করা যায়? কী করা যায় এখন?

একটা দৃশ্য মনে পড়ে লুহামের। একদিন সে খেলা দেখছিল টিভিতে। চলছিল তার প্রিয় ফুটবল খেলা। আহত হয়েছিল এক খেলোয়াড়। মাঠে পড়েছিল এই কাকের মতোই। একজন এসে চাপল তার বুক। বার বার হাত-পা করল এপাশওপাশ। শেষে বেঁচে গেল সেই খেলোয়াড়। মনে মনে কথা বলে লুহাম। হ্যাঁ, এখন তাই করব আমি।

কাকের বুকে হালকা চাপ দেয় লুহাম। চাপ দেয় সারা শরীরে। সোজা করে পা। টানে ঠোঁট ও পাখা। হালকা চাপড় দেয় কাকের পিঠে। এসব করতে থাকে বার বার। একসময় 'ক' বলে ওঠে কাক। নড়ে ওঠে কাকের চোখ। কিছুটা টান করে পা। সামান্য নাড়ায় পাখা। খুশিতে মন ভরে ওঠে লুহামের। মুখে ফুটে ওঠে হাসির রেখা। বুকে জাগে আশার আলো।

এবার অন্যদিকে খেয়াল করে লুহাম। দেখে সাথে নেই রাকিব ও সাকিব। উড়াউড়ি করছে কাকের দল। কর্কশ গলায় করছে কা কা। ছুটছে মাথার সামান্য উপর দিয়ে। উড়ছে গায়ের খুব কাছ দিয়ে। যেন এখনই ঠোকর দিবে মাথায়! খামচি দেবে গায়ে! তবুও ভয় পায় না লুহাম। রাগ করে না কাকদের ওপর। ভাবে, কাকেরা অনেক ভালো। একের বিপদে এগিয়ে এসেছে সবাই। ■

[শিশুদের উপযোগী এই গল্পটিতে ৪ বর্ণের অধিক কোনো শব্দ নেই, ৬ শব্দের অধিক কোনো বাক্য নেই, কোনোশব্দে যুক্ত বর্ণ নেই।]

বাংলার সম্মান

কথা ও সুরঃ ড. খান আসাদুজ্জামান

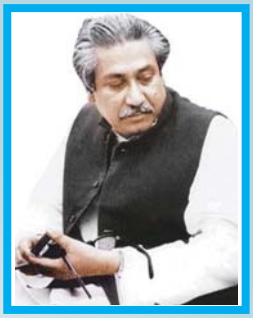

জাতির পিতার কন্যা তুমি
শেখ হাসিনা নাম
পিতার মতোই নামি তুমি
টুঙ্গিপাড়ায় ধাম।

পিতার স্বপ্ন তোমার চোখে
আনলে দেশে সাড়া
বিদ্যুৎ দিলে শহর-গঞ্জে
গাঁও-গেরাম আর পাড়া।

ফ্লাইওভার, মেট্রোরেলের
হুলস্থুল সব কাণ্ড
এখন আর কেউ কয় না তো
তলাবিহীন ভাণ্ড।

নদীর উপর সটান সেতু
ডিজিটালি দেশ
দেশবাসী আজ পাচ্ছে সেবা
লাগছে মজা বেশ!

মুক্তিযোদ্ধা পেল সম্মান
বয়স্করাও আছে
বিধবারাও নেই পিছিয়ে
স্বস্তিতে তাই বাঁচে।

ক্ষুধামুক্ত দেশ আজিকে
খাদ্যের অভাব নাই
যেখানে যাই উন্নতির সব
ছোঁয়া দেখতে পাই।

আকাশ ছোঁয়া স্বপ্ন মোদের
নয়কো অলীক কিছু
গর্বিত বাঙালি মোরা
নইকো কারো পিছু।

সেনা পুলিশ গ্রাম পুলিশ আর
বিজিবি আনসার
ছাত্র-জনতাও আছে সঙ্গে
গুণে মুগ্ধ তোমার।

বঙ্গবন্ধু স্যাটেলাইট যুগ
সম্প্রীতিতে ধর্ম
মাদক, জঙ্গি মুক্ত দেশ আজ
তুমি মোদের বর্ম।

রোহিঙ্গাদের ঠাঁই দিয়েছো
মানবতার মা
জয় করেছো নীল-জলধি
বিশ্ব জানে তা।

অ্যাওয়ার্ড পেলে বহুবিধ
বিশ্বজনীন মান
পেলে সম্মান ডক্টরেট
তুমি, বাংলার সম্মান।

শিক্ষা বাতায়ন

শাহানা আফরোজ

দেশসেরা অনন্যা

লেখাপড়ায় সেরা। সংগীত, চিত্রাঙ্কন ও সামাজিক কার্যক্রমেও সেরা। মেয়েটি এবার কলেজ পর্যায়ে সারা দেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থী নির্বাচিত হয়েছে। রাজশাহী কলেজের বিজ্ঞান বিভাগের দ্বিতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী অনন্যা শাহরিন। জাতীয় শিক্ষা সপ্তাহ-২০১৯ উপলক্ষে গত ২৬শে জুন ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটে শিক্ষামন্ত্রী দিপু মনি শাহরিনের হাতে শ্রেষ্ঠ শিক্ষার্থীর পুরস্কার তুলে দেন। শাহরিনকে প্রথমে কলেজের প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে। পরে দেশের আটটি বিভাগ ও ঢাকা মহানগরের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় উত্তীর্ণ হতে হয়েছে।

তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষা থাকছে না

প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত পরীক্ষা না রাখার সিদ্ধান্ত নিয়েছে প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। এই স্তরের মূল্যায়ন করা হবে ধারাবাহিকভাবে বিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীদের বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের ভিত্তিতে। আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই এই পরিকল্পনা বাস্তবায়ন হবে বলে জানিয়েছেন প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়। বর্তমানে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা এক বছর মেয়াদি। যেটি শুরু হয় পাঁচ বছর প্লাস বয়সি শিশুদের থেকে। এখন থেকে প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা দুই বছর মেয়াদি হবে এবং সেটা শুরু হবে চার বছর প্লাস বয়সি শিশুদের জন্য। এর আগে প্রাথমিক শিক্ষা সপ্তাহ উপলক্ষে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা শিশুদের ওপর চাপ কমানোর বিষয়ে নির্দেশ দেন। উল্লেখ্য জাতীয় শিক্ষানীতিতেও প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণিতে ধারাবাহিকভাবে মূল্যায়ন করতে বলা হয়েছে।

উত্তীর্ণ হলেন মা ও মেয়ে

চলতি বছর নিজের মেয়ের সঙ্গে এইচএসসি পরীক্ষা দিয়ে উত্তীর্ণ হয়েছেন নাটোরের বাগাতিপাড়ার মাসুমা খাতুন। তিনি কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষায় অংশ নিয়ে পেয়েছেন জিপিএ ৪ দশমিক ১৩। আর মেয়ে জান্নাতুল ফেরদৌস রাজশাহী সরকারি মহিলা কলেজ থেকে বিজ্ঞান বিভাগে জিপিএ ৫ পেয়েছে। মাসুমার বড়ো ছেলে বনি আমিন বাগাতিপাড়া সরকারি ডিগ্রি কলেজের স্নাতক শ্রেণির ছাত্র। মাসুমার বিয়ের ১৮ বছর পেরিয়ে গেছে। পিঠাপিঠি দুই ছেলে-মেয়েকে মানুষ করতে গিয়ে নিজের পড়ার কথা ভাবারই সময় পায়নি। তাই মেয়ের সাথে পরীক্ষা দিয়ে স্বপ্নকে পূরণ করলেন মাসুমা খাতুন।

দেশসেরা কলেজ

দেশের প্রাচীন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান রাজশাহী কলেজ। প্রাচীন স্থাপত্যশৈলীতে গড়া একটি ভবন। এ ভবনের পেছনেই আছে ছোট্ট একটি পুকুর। আছে শানবাঁধানো কয়েকটি ঘাট। পুকুরের পানির ওপর ফুটে আছে হাজারো পদ্মফুল। চার বছর ধরে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের র‍্যাংকিং-এ সেরা প্রতিষ্ঠান নির্বাচিত হয়েছে শিক্ষালয়টি। ৭৬টি কলেজের মধ্যে রাজশাহী কলেজের রেটিং পয়েন্ট ৭২.৯৬। ১৮২৮ সালে বাউলিয়া ইংলিশ স্কুল প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে শিক্ষানগরী হিসেবে রাজশাহী নগরীর যাত্রা শুরু। ১৮৩৬ সালে জাতীয়করণ করে প্রাদেশিক সরকার। পরে প্রতিষ্ঠানটির নামকরণ হয় রাজশাহী জিলা স্কুল। বর্তমানে এর নাম রাজশাহী কলেজিয়েট স্কুল। ১৮৭৩ সালে কলেজের মর্যাদা পায় স্কুলটি। নানা চড়াই-উতরাই পেরিয়ে রাজশাহী কলেজ এখন হয়ে উঠেছে দেশসেরা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। প্রতিষ্ঠানটিতে ২৩ হাজার ৭৩৯ জন শিক্ষার্থী আছে। এইচএসসি পরীক্ষায় কৃতকার্যের হার শতভাগ। এ ছাড়া ২০১৫ সাল থেকে স্নাতক পরীক্ষায় গড় পাসের হার ৯৪ থেকে ৯৫ শতাংশ। স্নাতকোত্তর পরীক্ষায়ও কয়েক বছরে কৃতকার্যের হার ৯৩ শতাংশের নিচে নামেনি। গড় উপস্থিতির হার দেখে শিক্ষার্থীদের পরীক্ষায় অংশগ্রহণের সুযোগ দেওয়া হয়। তাই ক্লাস ফাঁকি দেওয়া থেকে বিরত থাকে শিক্ষার্থীরা। শিক্ষার্থীদের গড় উপস্থিতির হার প্রায় ৭৮ শতাংশ। হাঁটি হাঁটি পা পা করে এইভাবেই দেশ সেরা হয়েছে রাজশাহী কলেজ।

মেয়ে যেন আলোকবর্তিকা

বিয়ের আগে স্কুল পর্যন্ত লেখাপড়া ছিল তার। মেয়ে তানজিলা আফরিনকে বাড়িতে পড়াতে গিয়ে নিজেরও আগ্রহ জাগে পড়ালেখার প্রতি। এরপর মা ইসমত আরা জয়পুরহাট শহর বালিকা বিদ্যালয়ে নবম শ্রেণিতে ভর্তি হন। আর তানজিলা পড়াশোনা করতেন জয়পুরহাট সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে। পরে মা ও মেয়ে ২০১৫ সালে একসঙ্গে মাধ্যমিক পরীক্ষায় পাস করেন। এবারে উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষায় বাণিজ্য বিভাগ থেকে মা জিপিএ-৪ দশমিক ২৫ এবং মেয়ে তানজিলা বিজ্ঞান বিভাগ থেকে জিপিএ-৪ দশমিক ৩৩ পেয়ে পাস করেন।

অশ্রুসজল ফলাফল

নিপীড়নের প্রতিবাদ করায় পুড়ে মরতে হয়েছে ফেনীর মাদ্রাসার শিক্ষার্থী নুসরাত জাহান রাফিকে। এবারের এইচএসসি পরীক্ষায় সে দুটি বিষয়ে পরীক্ষায় দিয়েছিল। এরপর আর হলো না...। ফলাফল প্রকাশের পর দেখা গেল ঐ দুটি বিষয়ে রাফি এ গ্রেড পেয়েছে। তার এই ফলাফল মা-বাবা ও দেশবাসীকে নাড়া দিয়েছে। আর আমাদের অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করার প্রেরণা দিয়েছে।

থাকি নিরাপদ, সাবধানে

বন্যা-ডেঙ্গু-চিকুনগুনিয়া

মো. জামাল উদ্দিন

ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া ভাইরাসজনিত রোগ। এই রোগ এডিস মশার মাধ্যমে ছাড়ায়। তবে সাধারণ চিকিৎসাতেই ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া সেরে যায়। কিন্তু হেমোরেজিক ডেঙ্গু জ্বর মারাত্মক হতে পারে।

ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধের উপায়

একটু সতর্ক থাকলে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া প্রতিরোধ করা যায়।

❑ মশার প্রজনন স্থল ধ্বংস করা

❑ তোমার ঘরে এবং আশপাশের যে-কোনো পাত্রে জমে থাকা পানি ৩ দিন পর পর ফেলে দিলে এডিস মশার লার্ভা মারা যাবে

❑ ফুলের টব, প্লাস্টিকের পাত্র, পরিত্যক্ত টায়ার, প্লাস্টিকের ড্রাম, মাটির পাত্র, বালতি, টিনের কৌটা, ডাবের খোসা, নারকেলের মালা, কন্টেইনার, মটকা, ব্যাটারি শেল, মাটির পুরান পাত্র ইত্যাদিতে এডিস মশা ডিম পাড়ে

❑ ব্যবহৃত পাত্রের গায়ে লেগে থাকা মশার ডিম অপসারণে পাত্রটি ঘষে পরিষ্কার করতে হবে

❑ অব্যবহৃত পানির পাত্র ধ্বংস বা উলটে রাখতে হবে

❑ রাতে ও দিনে ঘুমানোর সময় মশারি ব্যবহার করতে হবে

❑ স্বাস্থ্যকর পরিবেশ নিশ্চিত করো

❑ এডিস মশা থেকে সতর্ক থাক।

ডেঙ্গু জ্বরের লক্ষণ

ডেঙ্গু জ্বরে রোগীর সাধারণত উচ্চ জ্বর হয়। অনেকের আবার শরীরের তাপমাত্রা ১০১-১০২ ডিগ্রি ফারেনহাইট হয়। বর্তমানে এর ধরন পালটে গেছে। ডেঙ্গুর লক্ষণ হিসেবে নিম্নের লক্ষণগুলোর অন্তত ২টি প্রকাশ পাবে।

❑ তীব্র মাথা ব্যথা

❑ চোখের পিছনের দিকে তীব্র ব্যথা

❑ জয়েন্ট বা অস্থিসন্ধিতে ব্যথা

❑ মাংসপেশি অথবা হাড়ে ব্যথা

❑ হামের মতো র‍্যাশ বা ফুসকুড়ি বের হওয়া

❑ নাক ও দাঁতের মাড়ি থেকে অল্প রক্তপাত হতে পারে

❑ রক্তে শ্বেতকণিকার পরিমাণ কমে যাবে।

লক্ষণগুলো রোগীর বয়স অনুযায়ী ভিন্ন হতে পারে। ছোটো বাচ্চা ও প্রথমবারে আক্রান্তদের থেকে বয়স্ক, শিশু ও দ্বিতীয়বার আক্রান্তদের মাঝে রোগের তীব্রতা বেশি হয়।

চিকুনগুনিয়া রোগের লক্ষণ

❑ হঠাৎ জ্বর আসার সঙ্গে প্রচণ্ড গিটে গিটে ব্যথা

❑ প্রচণ্ড মাথা ব্যথা

❑ শরীরে ঠান্ডা অনুভূতি

❑ বমি বমি ভাব অথবা বমি

❑ চামড়ায় লালচে দানা

❑ মাংসপেশিতে ব্যথা

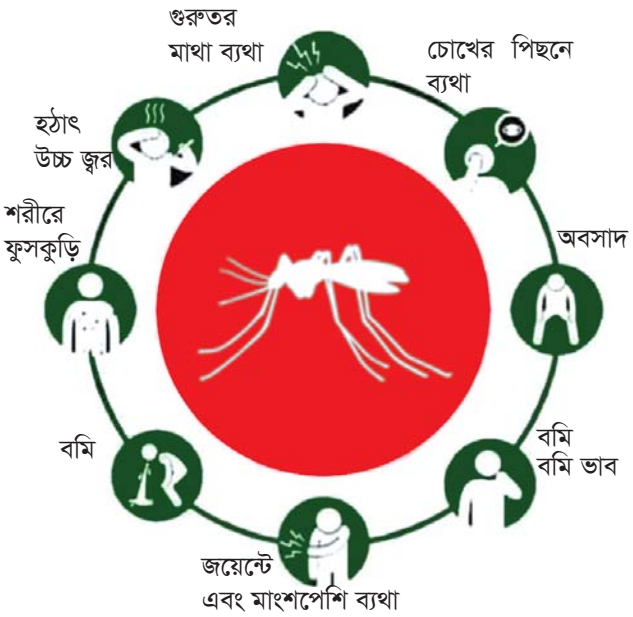

এডিস মশা ডেঙ্গু রোগ ছড়ায়। জ্বর হলে নিকটস্থ হাসপাতালে যোগাযোগ করে চিকিৎসা নিন। আপনার বাড়ির আশপাশে জমে থাকা পানি পরিষ্কার রাখুন। ডেঙ্গু মুক্ত থাকুন।

—রোগ নিয়ন্ত্রণ শাখা, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর।

মশার কামড় থেকে সুরক্ষাই হলো ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া থেকে বাঁচার সবচেয়ে উত্তম উপায়। শরীরের বেশির ভাগ অংশ ঢেকে রাখা (ফুল হাতা শার্ট এবং ফুল প্যান্ট পরা), জানালায় নেট লাগানো, প্রয়োজন ছাড়া দরজা জানালা না খোলা। তবে কারো ডেঙ্গু বা চিকুনগুনিয়া হলে নিকটস্থ স্বাস্থ্য কেন্দ্রে যোগাযোগ করা জরুরি।

আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থানকালীন সময়ে কী করবে

❑ বন্যার সময় জরুরিভিত্তিতে আশ্রয়কেন্দ্রের সঠিক ব্যবস্থাপনার জন্য আশ্রয়কেন্দ্র পরিচালনা কমিটির সভা আয়োজন এবং সমস্যা চিহ্নিত করে সমাধানের দায়-দায়িত্ব বন্টন করা।

❑ বন্যাকালীন সময় কোনো আশ্রয়কেন্দ্রে ভাঙন দেখা দিলে সামাজিকভাবে সে ভাঙন প্রতিরোধ করা

❑ আশ্রয়কেন্দ্রে অবস্থানকালে শিশু, বয়স্ক, অসুস্থ এবং পঙ্গুদেরকে প্রাধান্য দিতে হবে। তোমরা ছোটোরা সব সময় মায়ের কাছাকাছি থাকবে

❑ মনে রাখতে হবে শুধু জীবন ও সম্পদ বাঁচানোর জন্যই বন্যার সময় আশ্রয়কেন্দ্র ব্যবহার করব। তাই বন্যার পানি নেমে যাওয়ার সাথে সাথে তোমরা নিজেদের বাড়িতে ফিরে যাবে। ■

বাড়িতে বসে বিনামূল্যে ডেঙ্গু ও চিকুনগুনিয়া রোগের চিকিৎসা সেবা ও ঔষধ পেতে কল করুন- ০৯৬১১০০০৯৯৯

—মেয়র, ঢাকা দক্ষিণ সিটি কর্পোরেশন

মানুষ

গোপেশচন্দ্র সূত্রধর

মানুষ হলেই হয় না মানুষ
মানুষ হওয়া ভার
বিবেক বুদ্ধি থাকতে হয়
মনুষ্যত্ব আর।

জ্ঞানেন্দ্রিয় শিক্ষা দেয়
বিবেক বুদ্ধি জ্ঞান
মনুষ্যত্ব বড়ো গুণ
মানুষের প্রধান।

পশুর কোনো বিবেক নাই
আরো কত দোষ
পশুর কাজ করব কেন
আমরা তো মানুষ।

মানুষ হওয়ার চেষ্টা করি
এলাম যখন ভবে
মানুষ হলেই সার্থক হবে–
জন্ম মোদের তবে।

চন্দ্র জয়ের ৫০ বছর

পুরস্কৃত খুদে জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা

তানিয়া ইয়াসমিন সম্পা

চন্দ্র জয় করে মার্কিন মহাকাশচারী বদলে দিয়েছিলেন মানবসভ্যতার ইতিহাস। চাঁদের বুকে মানুষের পায়ের স্পর্শের সেই ৫০ বছর পূর্ণ হয় ২০শে জুলাই। ১৯৬৯ সালের ১৬ই জুলাই 'স্যাটার্ন ৫' রকেটে চেপে চাঁদে পাড়ি দিয়েছিল 'অ্যাপোলো ১১'। যদিও তারপর একাধিকবার সফল চন্দ্র অভিযান হয়েছে। তবু অ্যাপোলো-১১ এর অভিযান, মানব ইতিহাস ও সভ্যতার অন্যতম মাইলফলক হিসেবেই চিরস্থায়ী আসন করে নিয়েছে।

চন্দ্রাভিযানের অর্ধশত বছর উপলক্ষে ঐতিহাসিক এ দিনটিকে উদযাপন করতেই বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশন এবং জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘর কর্তৃপক্ষের যৌথ উদ্যোগে এ অলিম্পিয়াডের আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন যুক্তরাষ্ট্রের রাষ্ট্রদূত আর্ল আর মিলার। এ উপলক্ষে বিজ্ঞান জাদুঘরের মহাকাশ গ্যালারিতে সংযোজন করা হয় Timeline of space Exploration নামক চন্দ্রাভিযান ডিসপ্লে।

২০শে জুলাই ঘড়ির কাঁটায় সকাল ৮টা বাজতেই জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের প্রাঙ্গণ মুখরিত হয়ে উঠে একঝাঁক খুদে মেধাবীর পদচারণায়। কেউ বই পড়ছে। কেউ মোবাইলে সার্চ করে দেখছে জ্যোতির্বিজ্ঞানের নানা তথ্য। উদ্দেশ্য একটাই 'অ্যাস্ট্রোনমি অলিম্পিয়াড-২০১৯'।

সকাল নয়টায় শুরু হয়ে যায় সারাদেশ থেকে আসা ২৫০ জন প্রতিযোগীর অংশগ্রহণে 'অ্যাস্ট্রোনমি অলিম্পিয়াড-২০১৯' এর কুইজ পর্ব। শেষ হয় সকাল ১০টায়। এরপর শুরু হয় প্রতিযোগীদের হাতে বানানো রকেট মডেল প্রদর্শনী ও জ্যোতির্বিজ্ঞান বিষয়ক চিত্র প্রদর্শনী। তিন বিভাগ মিলে সর্বোচ্চ নম্বরের ভিত্তিতে সেরা প্রতিযোগী বাছাই করা হয়। ৩টি বিভাগে প্রতিযোগিতায় সিনিয়র গ্রুপে ৮ জন এবং জুনিয়র গ্রুপে ১৬ জনকে পুরস্কৃত করা হয়। বিজয়ীদের হাতে পুরস্কার হিসেবে ক্রেস্ট ও গলায় মেডেল পড়িয়ে দেন বাংলাদেশে নিযুক্ত আমেরিকান রাষ্ট্রদূত আর্ল রবার্ট মিলার ও রাশিয়ান কালচারাল সেন্টারের পরিচালক মি. অ্যাক্সিম।

পুরস্কারপ্রাপ্ত এ ২৪ জনকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে পারদর্শী করে তুলতে জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরে দুই দিনব্যাপী কর্মশালার আয়োজন করা হবে। কর্মশালায় নির্বাচিত সেরা ৫ জন রুমানিয়ায় অনুষ্ঠিত International Astro-Olympiad-এ অংশগ্রহণের সুযোগ পাবে। সেই সাথে সেরা ২ জনকে রাশিয়ায় অধ্যয়নের জন্য বৃত্তি প্রদান করা হবে।

বাংলাদেশ অ্যাস্ট্রোনমিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনের চেয়ারম্যান ও অলিম্পিয়াডের জুরি বোর্ডের সদস্য মশহুরুল আমিন-এর মতে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে আমাদের দেশে অ্যাস্ট্রোনমি পড়ানোর সুযোগ নেই। স্কুল পর্যায়ে পাঠ্যক্রমে এ বিষয়টিও নেই। কিন্তু এ বিষয়টিতে আমাদের শিশুদের কৌতূহল ও আগ্রহ অনেক বেশি। এটিকে আরো বাড়াতে হলে একটি ইনস্টিটিউট গড়া দরকার। তবে এ অলিম্পিয়াডের মাধ্যমে বেশ কিছু জ্যোতির্বিদ পাওয়া গেছে। এদেরকে বিদেশে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষ করে তুললে বাংলাদেশের জ্যোতির্বিজ্ঞান একদিন কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাবে বলে আমরা আশা করি। ■

প্রিন্সেস ডায়ানা পুরস্কার পেলেন দুই বাংলাদেশি

জান্নাতে রোজি

শতাধিক সমাজসেবী সংগঠনের সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন প্রিন্সেস ডায়ানা। তাঁর স্মরণে সমাজসেবায় যুক্ত তরুণদের ২০ বছর ধরে দেওয়া হয় ডায়ানা অ্যাওয়ার্ড। প্রিন্সেস ডায়ানার দুই ছেলে উইলিয়াম ও হ্যারি সরাসরি এই কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত। ১লা জুলাই প্রিন্সেস ডায়ানার জন্মদিন উপলক্ষে ঘোষণা করা হয়েছে এ বছরের পুরস্কারপ্রাপ্তদের নাম। যাদের মধ্যে আছেন বাংলাদেশের দুই তরুণী–শমী হাসান চৌধুরী ও জেবা খান।

শমীর সীমানা নেই

পানি, পয়োনিষ্কাশন ও পরিচ্ছন্নতা (ওয়াশ) বিষয়ক সচেতনতা তৈরির একজন সক্রিয় কর্মী হিসেবে ডায়ানা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন শমী হাসান চৌধুরী। কীভাবে পানি বিশুদ্ধ করতে হয়, ব্যক্তিগত পরিচ্ছন্নতার গুরুত্ব কী, মাসিকসংক্রান্ত কুসংস্কার কোন্‌গুলো এমন আরও নানা সচেতনতার কথা তিনি পৌঁছে দিচ্ছেন সুবিধাবঞ্চিত মানুষের কাছে। অ্যাওয়ারনেস থ্রিসিক্সটি নামে একটি সেবামূলক সংস্থার সহপ্রতিষ্ঠাতা শমী । সম্প্রতি অর্থনীতিতে স্নাতক শেষ করেছেন মালয়শিয়ার ইউনিভার্সিটি পুত্রা থেকে। নানা রকম কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত আছেন বলে প্রতিনিয়তই তাঁকে ছুটতে হয় এ দেশ থেকে ও দেশ।

২০১৪ সালে শমীর মা ডায়রিয়ায় আক্রান্ত হয়ে মারা যান। কিন্তু মাকে হারানোর পর পুরোদমে স্বাস্থ্য সুরক্ষা নিয়ে কাজ করতে শুরু করেন। কখনো ময়মনসিংহের পতিতাপল্লি, কখনো হরিজনপল্লি ঘুরে তিনি স্বাস্থ্য সুরক্ষার বার্তা ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর পুরস্কার হিসেবে অর্জন করেছেন নানা পুরস্কার। এত সবের মধ্যে ‘ডায়ানা অ্যাওয়ার্ড’ অন্যতম।

জেবার জয়গান

বছর পাঁচেক আগের কথা। জেবা খান তখন ঢাকার সানিডেইল স্কুলে পড়েন। গ্রামের বাড়ি কিশোরগঞ্জের বিশ্বনাথপুরে গিয়ে তাঁর পরিচয় হয় সেখানকার একটি মেয়ের সঙ্গে। গল্প করতে করতে জেবা জানতে পারেন, মাসিকের সময় মেয়েটি স্কুলে যায় না, তাকে বিছানায় ঘুমাতে দেওয়া হয় না, এমনকি গ্রামের পুকুরে গোসল করাও নিষিদ্ধ হয়ে যায়। শুনে খুব বিস্মিত হন জেবা। সেই বিস্ময় আরও বাড়ে, যখন ২০১৫ সালে উচ্চশিক্ষার জন্য কানাডায় পাড়ি দিয়ে তিনি আবিষ্কার করেন, কানাডাতেও মাসিক নিয়ে নানা রকম কুসংস্কার আছে। জেবা বুঝতে পারেন, এটি একটি বৈশ্বিক সমস্যা। এরপর পিরিয়ড ইনক নামে একটি সেবামূলক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে এই সমস্যা রোধে কাজ করতে শুরু করেন। সেই কাজের পুরস্কার হিসেবেই ডায়ানা অ্যাওয়ার্ড পেয়েছেন জেবা খান। এখন তিনি ইউনিভার্সিটি অব ব্রিটিশ কলম্বিয়ায় (ইউবিসি) ‘নিউরো সায়েন্স অ্যান্ড হিউম্যান ফিজিওলজি’ বিষয়ে শেষ বর্ষে পড়ছেন। পাশাপাশি কাজ করছেন গবেষক হিসেবে।

পিরিয়ড ইনক একটি যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক সংস্থা। বিনা মূল্যে স্যানিটারি ন্যাপকিন বিতরণের জন্য তহবিল সংগ্রহ করে এই সংস্থা, মাসিকবিষয়ক সচেতনতা তৈরির জন্য আয়োজন করে বিভিন্ন আলোচনা সভা, কর্মশালা ইত্যাদি।

বিভিন্ন কার্যক্রমের সঙ্গে যুক্ত থাকলেও গবেষণার প্রতি তাঁর বিশেষ আগ্রহ আছে। জেবার দুটি গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে দুটি প্রকাশনায়। স্নাতক শেষ করে তিনি বৈশ্বিক স্বাস্থ্য বা গণস্বাস্থ্য বিষয়ে স্নাতকোত্তর করতে চান। এ ছাড়া আরও বড়ো করতে চান পিরিয়ড ইনকের পরিসর। ■

দশদিগন্ত

সাদিয়া ইফ্‌ফাত আঁখি

মানুষের কাছে মাছের আবেদন

সাগরের বড়ো পাখনাবিশিষ্ট প্রাণী 'মানটা রে'। একদিন এক মানটা রে-এর ডান চোখে একটি বড়শি এঁটে যায়। এ বিপদ থেকে রক্ষা পেতে মাছটি সাহায্য চায় মানুষের কাছে। আর সাহায্য চাওয়ার ভিডিওটি অনলাইনে ছড়িয়ে পড়ে। সেখানে দেখা যায়, স্ত্রী মানটা রে শান্ত ও বিষাদকাতর আকুতিতে এক ডুবুরির কাছে বার বার ঘেঁষছে। স্থানটি হলো পশ্চিম অস্ট্রেলিয়ার কোরাল বে শহরের বিশ্ব ঐতিহ্য-ঘোষিত স্থান নিঙ্গালু রিফের কাছে। মাছটির আহ্বানে সাড়া দিয়ে ডুবুরি জেক উইলটন মাছটিকে সাহায্য করেন। কয়েকবার ডোবা-ভাসা করে বড়শিটি মাছটির চোখ থেকে খুলে দেন। মাছটির গায়ে মেছতার মতো দাগের জন্য জেক এর নাম দিয়েছেন 'ফ্রেকলস।'

গাছদের জন্য অ্যাম্বুলেন্স

এখন যেভাবে উষ্ণ হচ্ছে পৃথিবী, তাতে প্রকৃতি ধ্বংস হয়ে যাওয়ার আগে হাতে আর খুব বেশি সময় নেই বলে পরিবেশবিদেরা জানিয়েছেন। এই সময় শুধু নতুন গাছ লাগানো নয়, পুরনো গাছদের যত্ন এবং পরিচর্যাও প্রয়োজন। সম্প্রতি জীববৈচিত্র্য দিবস উপলক্ষে চেন্নাই-এর উপ-রাষ্ট্রপতি ভেঙ্কাইয়া নায়ডু চেন্নাই শহরে গাছেদের জন্য অ্যাম্বুলেন্স পরিসেবা চালু করেছেন। এই পরিসেবার নাম দিয়েছেন 'Tree Ambulance'। এই অ্যাম্বুলেন্স মূলত উপড়ে যাওয়া এবং উপড়ে ফেলা গাছকে অন্যত্র নিয়ে গিয়ে রোপণ করে। পাশাপাশি এই অ্যাম্বুলেন্সে আছে নানা ধরনের বীজ ও চারাগাছ। অ্যাম্বুলেন্সেই থাকবে দক্ষ মালি ও গাছ কর্মীরা। ফোন করলে অ্যাম্বুলেন্স বিনামূল্যে সেবা দিবে।

গিনেস বুকে ফয়সালের রেকর্ড

মাগুরার ছেলে মাহমুদুল হাসান ফয়সাল। গেল বছর ফুটবল ফ্রি স্টাইলার মাহমুদুল হাসান দুই হাতে ফুটবল রেখে এক মিনিটে ১৩৪ বার ফুটবল ঘুরিয়ে রেকর্ড গড়েছিলেন। এবার তিনি আরো একটি রেকর্ড গড়ে গিনেস বুকে নাম লিখিয়েছেন। এবারের রেকর্ডটি হয়েছে বাস্কেটবল হাতে। হাতের উপরে বাস্কেটবল রেখে ঘুরিয়ে সবাইকে চমকে দিয়েছেন। ফয়সাল তার হাতের উপর ১ মিনিটে ১৪৪ বার বাস্কেটবল ঘুরিয়ে এই রেকর্ড গড়েন। গিনেস বুক অব ওয়ার্ল্ড রেকর্ড কর্তৃপক্ষ তরুণ ফয়সালের স্বীকৃতি দিয়েছেন।

মানুষের সমান জেলিফিশ!

আকৃতিতে প্রায় পূর্ণবয়স্ক একজন মানুষের সমান। ব্যাঙের ছাতার মতো প্রসারিত মাথা। পিচরঙা শরীর ভাসিয়ে পানির মধ্যে যেন নেচে বেড়াচ্ছে প্রাণীটি। তার গতির প্রতিটি মুহূর্তে সৌন্দর্য ফুটে বেরুচ্ছে শরীরের প্রত্যেকটি প্রত্যঙ্গ থেকে। পেশাদার স্কুবা ডাইভার লিজি ডালি অবাক হয়ে দেখলেন আর ভাবলেন এটি মাছও নয়, অক্টোপাসও নয়। তাহলে কী? জেলিফিশ। এমনটিই জানান লিজি ও তার ক্যামেরাম্যান ড্যান অ্যাবোট। দৈত্যাকার জেলিফিশটিকে দেখা যায় ব্রিটেনের কর্নওয়াল সমুদ্রসৈকতের কাছাকাছি পানির নিচে।

সময়ের সাথে আছি

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

বিশেষ সতর্কীকরণ বিজ্ঞপ্তি

গুজব ছড়াবেন না, আইন নিজের হাতে তুলে নিবেন না।

- ‘পদ্মা সেতুর জন্য মানুষের মাথা ও রক্ত লাগবে’ এই গুজবকে কেন্দ্র করে ছেলে ধরা সন্দেহে গণপিটুনিতে বেশ কয়েকজন নিহত হওয়ার ঘটনা ঘটেছে।
- দেশবাসীর জ্ঞাতার্থে আবারো জানানো যাচ্ছে যে, এটি সম্পূর্ণরূপে একটি গুজব। কোনো প্রকার গুজবে কান দেবেন না এবং গুজব ছড়িয়ে মানুষকে বিভ্রান্ত করবেন না।
- গুজবে বিভ্রান্ত হয়ে ছেলেধরা সন্দেহে কাউকে গণপিটুনি দিয়ে আইন নিজের হাতে তুলে নিবেন না
- পদ্মা সেতু নির্মাণ দেশের সর্ববৃহৎ উন্নয়ন প্রকল্প। এ প্রকল্পের সাথে বাংলাদেশের ভাবমূর্তি জড়িত। একটি মহল এ উন্নয়ন ব্যাহত করার জন্য এ ধরনের গুজব রটিয়ে এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়াচ্ছে, যা গুরুতর অপরাধ।
- অনেকে না বুঝেই এটি শেয়ার করে অপরাধের অংশীদার হচ্ছেন।
- এ ধরনের গুজব ছড়িয়ে দেশে অস্থিতিশীলতা তৈরি করা এবং গণপিটুনি দিয়ে মৃত্যু ঘটানো গুরুতর ফৌজদারী অপরাধ
- যারা এ বিষয়ে মিথ্যা ও বিভ্রান্তিকর গুজব ছড়াচ্ছেন, তাদের খুঁজে বের করতে এবং আইনের আওতায় আনতে জেলা পুলিশ তৎপর রয়েছে
- আসুন, আমরা সকলেই সচেতন হই, গুজব ছড়ানো ও গুজবে কান দেওয়া থেকে বিরত থাকি এবং কাউকে ছেলেধরা হিসেবে সন্দেহ হলে গণপিটুনি না দিয়ে তাকে পুলিশের হাতে তুলে দেই।

প্রয়োজনে ৯৯৯-এ কল করে
পুলিশি সেবা গ্রহণ করি (টোল ফ্রি)

ডেঙ্গু পরীক্ষার নির্ধারিত ফি না মানলে অভিযোগ জানানোর হটলাইন

স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নির্দেশে ডেঙ্গু রোগ সংক্রান্ত সকল পরীক্ষা সরকারি হাসপাতালে বিনামূল্যে এবং বেসরকারি হাসপাতালে সর্বোচ্চ পাঁচশত টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।

এই নির্দেশনা না মানলে জরুরি মিনিস্টার মনিটরিং সেল হটলাইন:

০১৩১৪৭৬৬০৬৯, ০১৩১৪৭৬৬০৭০
০২-৪৭১২০৫৫৬, ০২-৪৭১২০৫৫৭

ই-মেইল: ministermonitorincell@gmail.com
এ যোগাযোগ করার জন্য অনুরোধ করা হয়েছে।

সূত্র: তথ্য বিবরণী, পিআইডি, ২৯শে জুলাই, ২০১৯

সতর্ক হই সংযত থাকি

১. সন্দেহের বশে মানুষ হত্যা মহা অন্যায়। প্রয়োজনে সন্দেহভাজন ব্যক্তিকে ধরে পুলিশ বা স্থানীয় প্রশাসনের হাতে তুলে দিন

২. অপরিচিত বাচ্চা দেখলে আদর করতে যাবেন না, এতে মহাবিপদে পড়তে পারেন

৩. এসময় নতুন কোনো জায়গায় একা ভ্রমণে বিরত থাকুন

৪. কোথাও একা বা দলবদ্ধভাবে বেড়াতে গেলে আগেই সেখানকার স্থানীয় কাউকে বা প্রশাসনকে জানিয়ে রাখুন।

সাজনিন আসমা (ইস্পা), ষষ্ঠ শ্রেণি, খিলগাঁও গভ. কলোনি উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়, খিলগাঁও, ঢাকা

সিদরাতুল মুনতাহা, ষষ্ঠ শ্রেণি, এমডব্লিউ আদমজি স্কুল, নারায়ণগঞ্জ

মো. আহনাফ সিদ্দিক, দ্বিতীয় শ্রেণি, গলাচিপা মডেল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, গলাচিপা, পটুয়াখালী

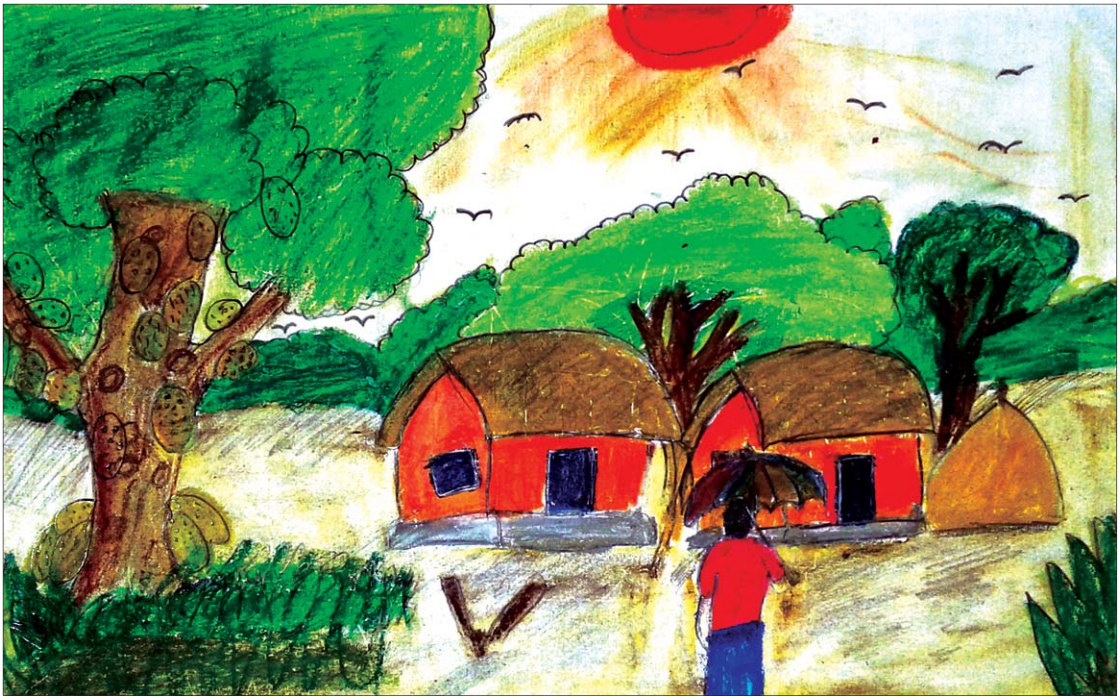

তাহমিদ আজমাঈন আহনাফ, তৃতীয় শ্রেণি, ন্যাশনাল আইডিয়াল স্কুল, পূর্ব রামপুরা, বনশ্রী, ঢাকা

ফারিয়া সাবরিন, ষষ্ঠ শ্রেণি, সুনামগঞ্জ উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়

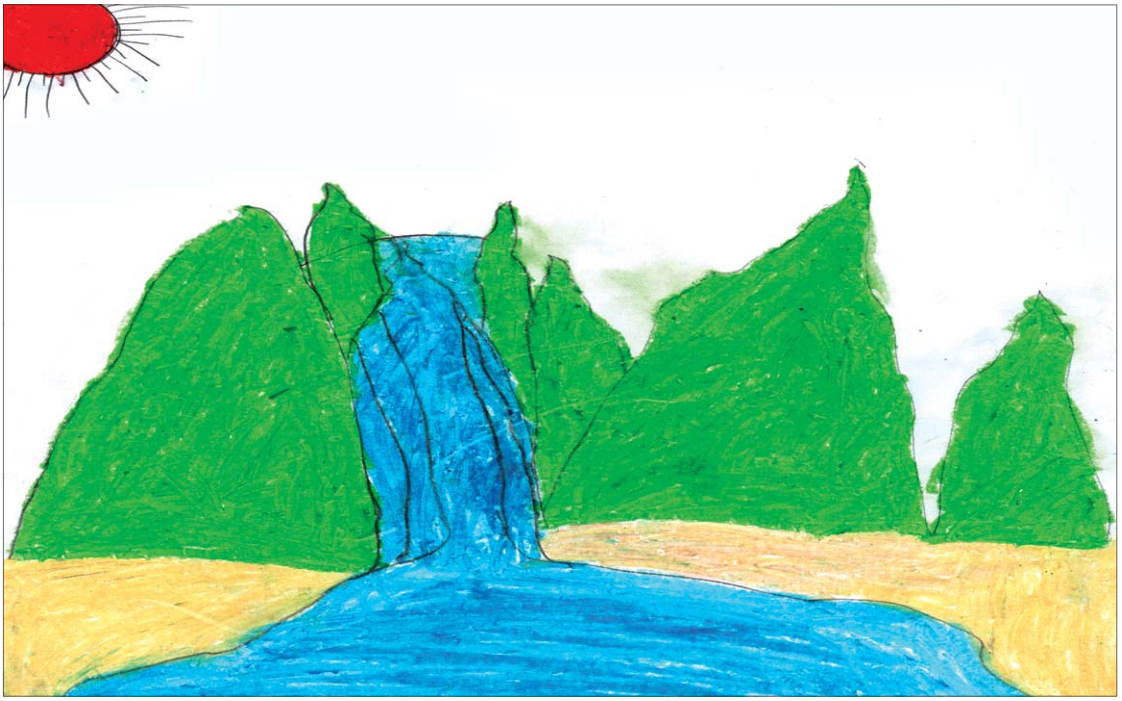

আরিসা আদিবা, প্রথম শ্রেণি, বিয়াম ল্যাবরেটরি স্কুল

বুদ্ধিতে ধার দাও

নাদিম মজিদ

শব্দধাঁধা

পাশাপাশি: ১. ইউরোপের একটি দেশ, ৪. বাংলাদেশের একটি জেলা, ৯. এক ধরনের কাপড়, ১০. বাংলাদেশের একটি বিভাগ, ১১. একটি ভেষজ উদ্ভিদ,

উপর-নিচ: ২. মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক চলচ্চিত্র, ৩. বাগান, ৪. ঊষা, ৫. বিদেশ, ৬. চোখ, ৮. ফুলবিশেষ, ৯. বৃক্ষ

■	১.		২.			■	■
৩.	■	■		■	■	■	■
	■	৪.		■	৫.	■	৬.
৭.	৮.		■	■		■	
■		■	■	৯.			
■	১০.				■	■	■
■		■	■		■	■	■
■	■	■	■	১১.			

ব্রেইন ইকুয়েশন

সরল অঙ্কের মৌলিক নিয়মকে মেনে তৈরি করা হয়েছে ব্রেইন ইকুয়েশন। ছকটির খালি ঘরগুলো মেলানোর সময় অবশ্যই পাশাপাশি এবং উপর-নিচের অন্যান্য সমীকরণগুলোও মেলাতে হবে।

৪	*		*	২	=	
/	■	*	■	+	■	/
	+	৩	-		=	৪
+	■	+	■	+	■	+
৫	+		-	৪	=	
=	■	=	■	=	■	=
	+	৫	-		=	৫

গত সংখ্যার সমাধান

■	ন	রে	ন্দ্র	মো	দী	■	■
■	গ	■	■	হ	■	■	■
গ	র	হা	জি	র	■	মা	ঘ
র	■	ল	■	■	■	কা	■
ম	য়	দা	ন	■	ক	ল	স
■	■	■	ল	■	ল	■	র
■	■	■	ছি	ট	ম	হ	ল
গি	র	গি	টি	■	■	■	■

গত সংখ্যার সমাধান

৩	*	৪	-	৭	=	৫
*	■	+	■	-	■	+
২	*	১	+	৪	=	৬
-	■	-	■	-	■	-
৫	+	২	-	১	=	৬
=	■	=	■	=	■	=
১	*	৩	+	২	=	৫

ছক মিলাও

শব্দ ধাঁধার মতোই এক ধরনের ধাঁধাঁ ছক মিলাও। ছকে যে-সব শব্দ বসিয়ে মেলাতে হবে, তা নিচে সংকেতের পাশে দেওয়া হলো। বোঝার সুবিধার্থে একটি ঘর পূরণ করে দেওয়া হলো।

সংকেত: আসান, আবাহনী, মালয়েশিয়া, শিলাইদহ, মালদ্বীপ, রত্নদ্বীপ, ইনসান, দোপেয়ে, বাহন, আদা, দাহ

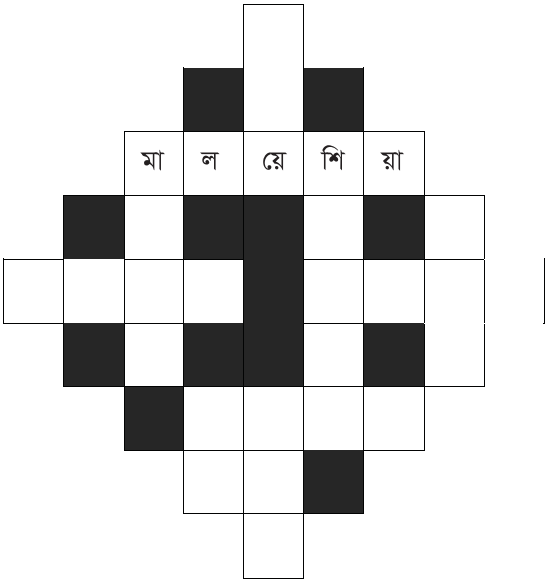

গত সংখ্যার সমাধান:

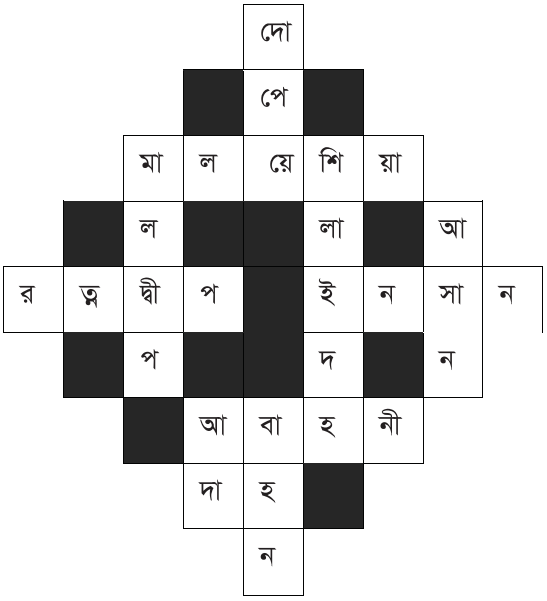

নাম্ব্রিক্স

নিচের ছকটির নাম নাম্ব্রিক্স। ১-৮১ পর্যন্ত সংখ্যাগুলো থেকে ছকটিতে প্রতিটি সংখ্যা একবার করে বসাতে হবে। সংখ্যাগুলোকে ক্রমিকভাবে বসাতে হবে। বসানোর সময় পরের সংখ্যা পাশাপাশি বা উপরে-নিচে আকারে বসবে, কোনাকুনি বসানো যাবে না।

৫		৩	১৮					২৩
	৭			৫২	৫১	৪৪	৪৩	
৯		১						
	১৩		১৫					
১১		৬৭	৬৬			৪৭		
	৭৯			৫৬	৫৭		৩৯	
				৬৩		৩৭		
	৮১		৭১				৩৫	
৭৫		৭৩			৬০	৩৩		৩১

গত সংখ্যার সমাধান

১	৪	৫	১৮	১৯	২২	২৩	২৪	২৫
২	৩	৬	১৭	২০	২১	২৮	২৭	২৬
৯	৮	৭	১৬	১৫	৩০	২৯	৩৪	৩৫
১০	১১	১২	১৩	১৪	৩১	৩২	৩৩	৩৬
৬৫	৬৬	৬৭	৬৮	৬৯	৫০	৪৯	৩৮	৩৭
৬৪	৭৭	৭৮	৭৯	৭০	৫১	৪৮	৩৯	৪০
৬৩	৭৬	৮১	৮০	৭১	৫২	৪৭	৪৬	৪১
৬২	৭৫	৭৪	৭৩	৭২	৫৩	৫৪	৪৫	৪২
৬১	৬০	৫৯	৫৮	৫৭	৫৬	৫৫	৪৪	৪৩

সঠিক উত্তর পাঠিয়ে দাও এই ঠিকানায়

সম্পাদক, নবারুণ
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০।
ইমেইল: editornobarun@dfp.gov.bd

বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে ডিএফপির কার্যক্রম

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান-এর জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন উপলক্ষে চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর (ডিএফপি)-এর কর্মপরিকল্পনা-

পকেট পুস্তিকা তৈরি : 'বাংলাদেশকে জানতে হলে বঙ্গবন্ধুকে জানো'–শিরোনামে বঙ্গবন্ধুর গুরুত্বপূর্ণ উক্তি নিয়ে ২৫ হাজার কপি পকেট পুস্তিকা মুদ্রণ করা হবে।

সংকলন পুস্তিকা তৈরি : বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতির পিতার জীবন ও কর্মের ওপর দেশের প্রতিথযশা প্রাবন্ধিক, সাহিত্যিকদের লেখা নিয়ে ১০ হাজার কপি সংকলন গ্রন্থ মুদ্রণ করা হবে

সচিত্র বঙ্গবন্ধু : বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতির পিতার জীবন ও কর্মের ওপর ২০০ পৃষ্ঠার 'সচিত্র বঙ্গবন্ধু' শিরোনামে ১০ হাজার কপি পুস্তক মুদ্রণ করা হবে।

পোস্টার তৈরি : বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ বিষয়ে ১০ লক্ষ কপি দুটি পৃথক পোস্টার বিজি প্রেস থেকে মুদ্রণ করা হবে।

ছড়া-কবিতা সংকলন: বঙ্গবন্ধুর জন্ম শতবার্ষিকী উপলক্ষে জাতির পিতার জীবন ও কর্মের ওপর এ অধিদপ্তর কর্তৃক প্রকাশিত নিয়মিত সংখ্যা ছাড়াও সচিত্র বাংলাদেশ ও মাসিক নবারুণ পত্রিকায় বিশেষ সংখ্যা হিসেবে পূর্ববর্তী সংখ্যাসমূহে প্রকাশিত বঙ্গবন্ধুর ওপর রচিত ছড়া-কবিতা সংকলন করার বিষয়ে প্রস্তাব করা হয়েছে।

প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ: 'বঙ্গবন্ধু থেকে বিশ্ববন্ধু' শিরোনামে ২০ মিনিট ব্যাপী প্রামাণ্য চিত্রে বিশ্বের বড়ো নেতাদের মন্তব্য/ বক্তব্য এবং অভিমত তুলে ধরা হবে। বিশ্বের বড়ো বড়ো কবিদের কবিতায় বঙ্গবন্ধু বিষয়টি তুলে ধরা হবে। ইংরেজি সাবটাইটেল/ ধারা বর্ণনাসহ।

প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ: 'শিশুদের সাথে বঙ্গবন্ধু' শিরোনামে ৩-৫ মিনিট ব্যাপ্তির প্রামাণ্য চিত্র নির্মাণ করা হবে। ■

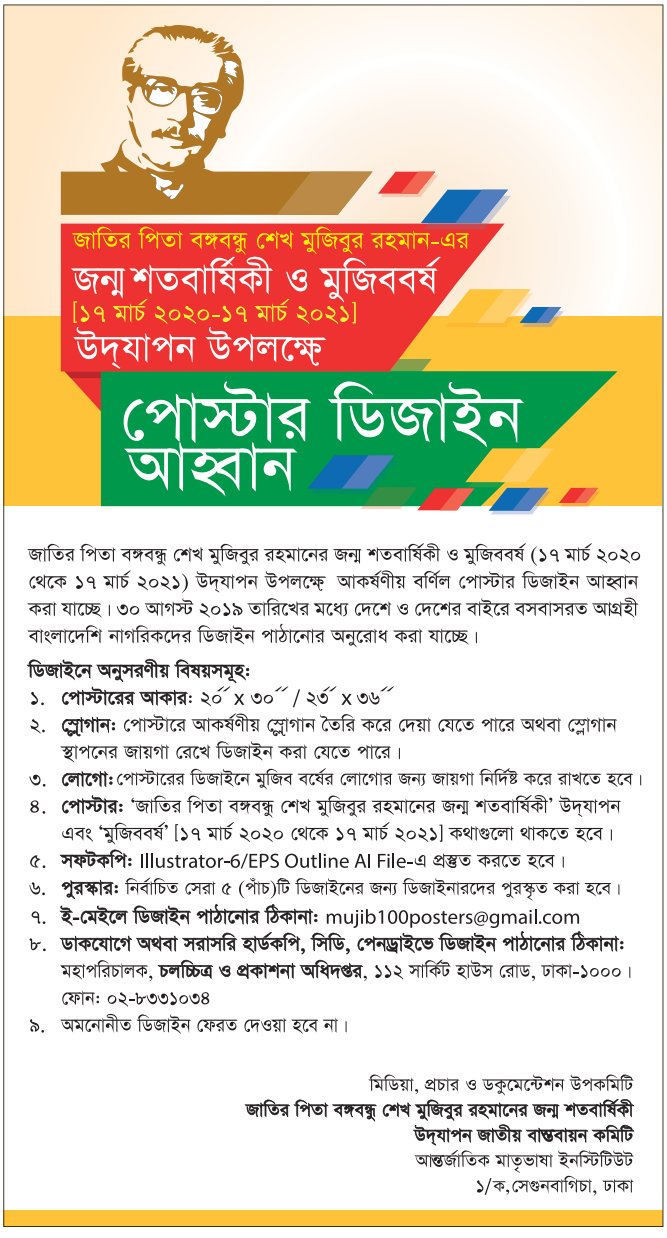

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী ও মুজিববর্ষ (১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ১৭ মার্চ ২০২১) উদ্‌যাপন উপলক্ষে আকর্ষণীয় বর্ণিল পোস্টার ডিজাইন আহ্বান করা যাচ্ছে। ৩০ আগস্ট ২০১৯ তারিখের মধ্যে দেশে ও দেশের বাইরে বসবাসরত আগ্রহী বাংলাদেশি নাগরিকদের ডিজাইন পাঠানোর অনুরোধ করা যাচ্ছে।

ডিজাইনে অনুসরণীয় বিষয়সমূহ:

১. **পোস্টারের আকার:** ২০˝ x ৩০˝ / ২৩˝ x ৩৬˝
২. **স্লোগান:** পোস্টারে আকর্ষণীয় স্লোগান তৈরি করে দেয়া যেতে পারে অথবা স্লোগান স্থাপনের জায়গা রেখে ডিজাইন করা যেতে পারে।
৩. **লোগো:** পোস্টারের ডিজাইনে মুজিব বর্ষের লোগোর জন্য জায়গা নির্দিষ্ট করে রাখতে হবে।
৪. **পোস্টার:** 'জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী' উদ্‌যাপন এবং 'মুজিববর্ষ' [১৭ মার্চ ২০২০ থেকে ১৭ মার্চ ২০২১] কথাগুলো থাকতে হবে।
৫. **সফটকপি:** Illustrator-6/EPS Outline AI File-এ প্রস্তুত করতে হবে।
৬. **পুরস্কার:** নির্বাচিত সেরা ৫ (পাঁচ)টি ডিজাইনের জন্য ডিজাইনারদের পুরস্কৃত করা হবে।
৭. **ই-মেইলে ডিজাইন পাঠানোর ঠিকানা:** mujib100posters@gmail.com
৮. **ডাকযোগে অথবা সরাসরি হার্ডকপি, সিডি, পেনড্রাইভে ডিজাইন পাঠানোর ঠিকানা:** মহাপরিচালক, **চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর**, ১১২ সার্কিট হাউস রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন: ০২-৮৩৩১০৩৪
৯. অমনোনীত ডিজাইন ফেরত দেওয়া হবে না।

মিডিয়া, প্রচার ও ডকুমেন্টেশন উপকমিটি
জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্ম শতবার্ষিকী উদ্‌যাপন জাতীয় বাস্তবায়ন কমিটি
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট
১/ক,সেগুনবাগিচা, ঢাকা

সচিত্র বাংলাদেশ

দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য
ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা

সচিত্র বাংলাদেশ-এর
বার্ষিক চাঁদা ৩০০.০০ টাকা
ষান্মাসিক ১৫০.০০ টাকা
প্রতি সংখ্যা ২৫.০০ টাকা

সচিত্র বাংলাদেশ নিয়মিত পড়ুন, লেখা পাঠান ও মতামত দিন। লেখা সিডি অথবা ই-মেইলে পাঠান।
e-mail: editorsb@dfp.gov.bd
dfpsb@yahoo.com

Bangladesh Quarterly

ত্রৈমাসিক ইংরেজি পত্রিকা

Bangladesh Quarterly
Yearly : Tk. 120/-
Half yearly : Tk. 60/-
Per issue : Tk. 30/-

- The Bangladesh Quarterly publishes news, articles, features and literary works on history, culture, heritage, economy, development and progress of the country.
- A write-up within 2000 words is preferred.
- Would appreciate, if relevant photographs (with caption) are attached with any article.
- The soft copy may be sent other than CD or Pen drive to the following e-mail address : bangladeshquarterly@yahoo.com
  bdqtrly2@gmail.com

অ্যাডহক প্রকাশনা

বাংলাদেশের ইতিহাস, ঐতিহ্য ও পর্যটনসহ বিষয়ভিত্তিক বাংলা ও ইংরেজি ভাষায় চার রঙে আর্টপেপারে মুদ্রিত ছবি সমৃদ্ধ বিভিন্ন প্রকাশনা নিজের সংগ্রহে রাখতে নিচের ঠিকানায় যোগাযোগ করুন।

মিট বাংলাদেশ (২০০ পৃষ্ঠা): ১,০০০ টাকা
বাংলাদেশের পাখি (২১৬ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের বন্যপ্রাণী (২৪০ পৃষ্ঠা) : ১,২৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : সিলেট বিভাগ (১১২ পৃষ্ঠা): ৭৫০ টাকা
বাংলাদেশের পর্যটন আকর্ষণ : চট্টগ্রাম বিভাগ (২০০ পৃষ্ঠা) : ১,২০০ টাকা

কমিশন : ২৫%
এজেন্ট কমিশন : ৩৩%

এজেন্ট, গ্রাহক নিম্ন ঠিকানায় যোগাযোগ করুন

সহকারী পরিচালক (বিক্রয় ও বণ্টন)
চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
১১২, সার্কিট হাউজ রোড, ঢাকা-১০০০। ফোন : ৯৩৫৭৪৯০
ওয়েবসাইটে সচিত্র বাংলাদেশ, নবারুণ ও বাংলাদেশ কোয়ার্টারলি পড়ুন
www.dfp.gov.bd

Regd, Dha, 143-Monthly Nobarun, Vol-44, No- 2, August 2019, Tk-20.00

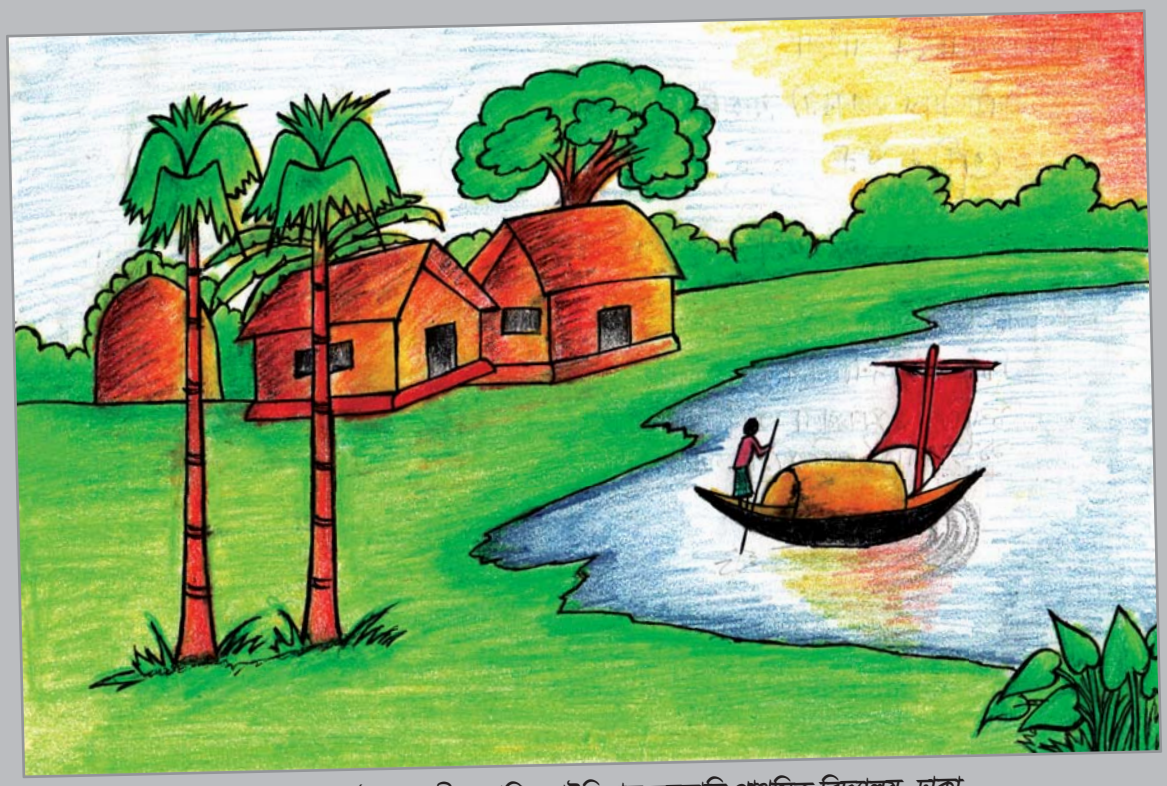

জান্নাতুল নাইমা, তৃতীয় শ্রেণি, আইডিয়াল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঢাকা

চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর
তথ্য মন্ত্রণালয়
১১২ সার্কিট হাউজ রোড ঢাকা